নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষায় ভারতের পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লব

নভেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য ও শিক্ষা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে কমরেড শিবদাস ঘোষ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কিছু বিষয়ে আলোকপাত করেন। তৎকালীন সময়ে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে নানা বিষয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল, সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিজেদের ঐক্য বজায় রেখে মতাদর্শগত পার্থক্য দূর করার প্রশ্নে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর যথেষ্ট অর্থনৈতিক উন্নতি হলেও সংস্কৃতিগত-মতাদর্শগত ক্ষেত্রে আপেক্ষিক অর্থে চিন্তা, চেতনার মানের অবনমনে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। আলোচনায় ভারতবর্ষের বিপ্লবের স্তর কেন সমাজতান্ত্রিক তার বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। যুক্ত গণআন্দোলনে আদর্শগত সংগ্রামের অপরিহার্যতা ব্যাখ্যা করেছেন।

দলের পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটির সেক্রেটারিয়েট, নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী দিবসে কতকগুলো বিষয় নিয়ে আমাকে আলোচনা করতে অনুরোধ করেছেন। একটা সভায় এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁদের উত্থাপিত সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হবে কি না জানি না, তবে যতদূর সম্ভব আমি চেষ্টা করব। আমরা আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় যে পরিস্থিতির আজ সম্মুখীন হয়েছি, ঠিক সেই সময়ে নভেম্বর বিপ্লব দিবসের তাৎপর্য এবং তার মূল শিক্ষা কী এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হিসাবে আমরা কী শিক্ষা তার থেকে নিতে পারি এবং জনসাধারণের সামনে আর একবার সেই শিক্ষা তুলে ধরতে পারি, সেটাই

আজ খুব গুরুত্বপূর্ণ।

কমিউনিস্ট আন্দোলনে জাতীয়তার প্রভাব

প্রথমত, সমস্ত দুনিয়ার রাজনীতি এবং তার সাথে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলন — বর্তমানে আদর্শগত দিক থেকে একটা চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে। অবশ্য এজন্য ঘাবড়াবার কোনও কারণ নেই। কারণ, বিপ্লবী রাজনৈতিক আন্দোলনটা একটানা নির্ঝঞ্ঝাট ভাবে এগিয়ে চলে, এমন ধারণা আমাদের নেই। পার্টির কাছ থেকে যতটুকু শিক্ষা আপনারা পেয়েছেন, তাতে আপনারাও সেটা বোঝেন। তবু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট আন্দোলনে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তা সবাইকেই খানিকটা ভাবাচ্ছে। আদর্শগত ক্ষেত্রে কতকগুলো বিরোধ দেখা দিয়েছে, মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। তাতেও এত উদ্বেগের কারণ ছিল না। কারণ, আমরা সবাই জানি, বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধ বা কোনও একটা পরিস্থিতি বা ঘটনা সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য ঘটা স্বাভাবিক। বিশেষ করে যতদিন পর্যন্ত আমাদের সংগ্রামের জাতীয় রূপটি নিঃশেষিত হয়ে গিয়ে শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্রগুলির বিশ্বসংঘের আবির্ভাব না ঘটছে এবং জাতীয় সীমানার বাইরে আন্তর্জাতিক শক্তিকেন্দ্র এবং বিশ্বসমাজের উদ্ভব না ঘটছে, ততদিন পর্যন্ত বিশেষ রকমের জাতীয় মানসিকতা বা তার জাতীয় রূপ আমাদের লড়াইয়ের মধ্যে একটা প্রধান অঙ্গ হিসাবে থাকছে, যদিও এই লড়াইয়ের মর্মবস্তু বা সমাজতান্ত্রিক আদর্শের চরিত্র আন্তর্জাতিক। তবু এই আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলনটি পুঁজিবাদের বা বিপ্লবের অসম বিকাশের জন্যই বিভিন্ন দেশে তার জাতীয় পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। এতে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই এবং এটাই প্রতিটি বিপ্লবীর কাছে এবং সমস্ত দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ঘটনা।

এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলেই কমিউনিজমের আন্তর্জাতিক মানস চেতনা চেষ্টা করেও জাতীয় অবমাননাবোধ ও জাতীয় ভাব থেকে কিছুতেই নিজেদের মুক্ত করতে পারছে না। যতক্ষণ দেশে দেশে জাতীয় রূপটি বিশেষ বিশেষ আলাদা পরিস্থিতির জন্যই আলাদা রয়েছে এবং যেহেতু জাতীয় রাষ্ট্রগুলোর ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানের সময়কাল শেষ হয়ে যায়নি, সেইহেতু কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভাবধারা আন্তর্জাতিক হলেও এই অবস্থার মধ্য দিয়ে চলার ফলে কেউই জাতীয় মানসিকতা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখতে পারে না। এ জিনিস কোনও পার্টিই পারছে না, আমি একথা বলছি না। কিন্তু পারা কঠিন, কষ্টকর — এটাই শুধু বলতে চাইছি। প্রতিটি দেশের কমিউনিস্ট

পার্টিই চায় নিজেকে সংকীর্ণ জাতীয়তা বা জাতীয় অহংবোধ থেকে —যেটাকে বুর্জোয়ারা প্রধান অস্ত্র হিসাবে বিপ্লবের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে তার থেকে— জনগণকে এবং নিজেদের মানসিকতাকে মুক্ত রেখে আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ববোধে উপনীত হতে, মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুংয়ের মতো বিরাট মার্কসবাদীদের চিন্তা অনুযায়ী 'দুনিয়ার শ্রমিক এক হও' ভাবনায় উপনীত হতে। কোনও মার্কসিস্ট পার্টি বা কোনও দেশের বিপ্লব কোনও মতেই সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না, যদি আন্তর্জাতিক প্রশ্নে তার দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবসম্মত ও সঠিক না থাকে। যে পার্টি বিপ্লব করবে, তার এই উপলব্ধি থাকতেই হবে।

আমরা বলতে পারি, আমরা এই চেষ্টাটা করছি, সাধনার মতো করেই করছি। কিন্তু এই চেষ্টা করতে গিয়ে আবার বিপত্তি দেখা দিচ্ছে, বিচারে পার্থক্য হচ্ছে। এমনিতেই একটা পার্টির মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ে ও ব্যক্তি পর্যায়ে বিভিন্নতার জন্য অভিজ্ঞতার পার্থক্য ঘটে এবং ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, এলাকায়-এলাকায় কমরেডদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। আর এটা তো একটা জাতীয় স্তরের ব্যাপার। প্রতিটি জাতি তার তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে লড়াই করছে। ফলে তাদের শিক্ষা, অভিজ্ঞতা আলাদা হচ্ছে এবং তা তাদের ভাবনা ও মানসিকতাকেও প্রভাবিত করছে। কিন্তু সবাইকে প্রভাবিত করছে, বিষয়টা আবার এমনও নয়। কেউই আন্তর্জাতিকতার নিরিখে এইসবের চরিত্র বুঝে, অর্থাৎ সমস্ত জিনিসগুলোকে তত্ত্ব বা আদর্শগতভাবে মিলিয়ে বুঝে, চিন্তাগত ও চরিত্রগত দিক থেকে নিজেদের জাতীয় অবমাননাবোধ (national humiliation) থেকে মুক্ত করে বিচার করতে পারেনি, একথা সত্য নয়। লেনিন-স্ট্যালিনের মতো নেতাদের পক্ষে তা সম্ভব হয়েছে। মাও সে-তুংয়ের চিন্তা-ভাবনার মধ্যেও প্রধানত আমরা এই জিনিসটা লক্ষ করি। এছাড়াও বিশ্বে আরও অনেকেই পেরেছেন। আমাদের ক্ষেত্রে বলতে পারি, সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থবোধের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে আমাদের বিচ্যুতি হয়নি, ভুল থাকতে পারে। ভুল তো আন্তর্জাতিকতাবাদী চরিত্র থাকলেও হতে পারে। এই প্রশ্নটা জ্ঞান ও বিচক্ষণতার সঙ্গে যুক্ত। এটা অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের প্রশ্ন। এটার সঙ্গে যুক্ত আর একটি প্রশ্ন, তা হচ্ছে, আমরা যত বড় জ্ঞানীই হই, আমরা চির অভ্রান্ত (infallible) নই। আমরা ভুল করতে পারি না, একথা কেবল নির্বোধরাই বলতে পারে, কোনও মার্কসবাদী বলতে পারে না। কোনও স্তরেই, যত বড় বিদ্বজ্জন ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মানুষ আমরা হই না কেন, তাতে ভুল আমরা কম করতে পারি, কিন্তু ভুল একদম করব না, আমাদের কোনও ভুল হতে পারে না, আমাদের কোনও

ভুল হবে না — একথার মানে হচ্ছে, আমরা শেষ হয়ে গিয়েছি।

ভুল আমাদের শিক্ষক

কাজেই ভুলের জন্য বিপদ ছিল না, মতপার্থক্যের জন্যও বিপদ ছিল না। মার্কসবাদীরা জানে, চলতে গেলে ভুল হয়। অভিজ্ঞতা থেকে সেটা আমরা সংশোধন করি। ভুল করেই জ্ঞান বাড়ে। এজন্য মার্কসবাদে একটা কথা আছে, ভুল হল আমাদের শিক্ষক। ভুলকে আমরা দু'ভাবে গ্রহণ করতে পারি। ভুল থেকে আমরা হীনমন্যতায় ভুগতে পারি, আবার ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা আরও শক্তিমান হতে পারি, আন্দোলনকে আরও নিখুঁতভাবে গড়ে তুলতে পারি, আরও শক্তিশালী করতে পারি। এইভাবেই আমরা ভুল বা ব্যর্থতাকে দেখতে পারি। আমরা যদি সত্যিকারের মার্কসবাদী হই, তাহলে এভাবেই, অর্থাৎ শিক্ষক হিসাবেই, ভুলকে আমাদের অ্যাপ্রোচ করার কথা। আবার একথার মানে এই নয় যে, যখনই ভুল করব, তখনই অত্যন্ত হালকাভাবে তা দেখব, আর মন্ত্রপড়ার মতো করে বলব যে, মার্কসবাদীরা তো ভুলের জন্য ভয় পায় না, ফলে তারা একটার পর একটা ভুল করে যাবার দাবি রাখে। না, এভাবে বিষয়টাকে দেখবার রীতি হতে পারে না। প্রত্যেকটি ভুলই গুরুতর চিন্তার বিষয় এবং সেইজন্যই ভুলের চরিত্রের বিশ্লেষণ করতে হয়। একজন প্রকৃত মার্কসবাদী যে ধরনের ভুল করতে পারে, আমাদের ভুলটা হবে সেই ধরনের। অর্থাৎ, মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিগত প্রশ্নে অটল থাকা, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে অটল থাকা — তা সত্ত্বেও অভিজ্ঞতার অভাব ও বিচিত্র ধরনের কিছু আপাত অদৃশ্য কারণে আমাদের ভুল হতে পারে। এটা বিজ্ঞানেরই কথা। যতই আমরা জানি, সবসময়ই কিছু না কিছু, সমস্ত ঘটনা না হলেও কিছু আপাত অদৃশ্য ঘটনার ফ্যাক্টর আমাদের সামনে থেকে যাচ্ছে, কাজ করছে। এই চরিত্রের ভুল সমস্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাতেই আছে, থাকে। সব ফ্যাক্টরগুলি সমেত আমরা জানছি — এটা সম্ভব নয়। মানুষের জীবন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নিয়েও একই কথা। সত্য সাধনার, জীবনকে সুন্দর করবার নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিপ্লবের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। তাছাড়া বিপ্লব কথাটার কোনও মানে হয় না।

স্বাভাবিক কারণেই তাই ভুল হয়েছে। এটা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ক্ষেত্রে মূল বিচার্য বিষয় নয়। অনেকে বলছেন, অমুকে এই ভুলটা করেছে বলেই তার সাথে আমাদের অবাঞ্ছিত কাণ্ডকারখানা ঘটছে । আমি সেই কথাতেই আপনাদের টেনে নিয়ে যেতে চাইছিলাম। আজ হয়তো কিছু বিষয়ে আমাদের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য দেখা দিচ্ছে। হয়তো কেউ ভুল করছে, মারাত্মক ভুল করছে। কিন্তু

তার জন্যে আমাদের মধ্যে শত্রুতার মনোভাব হবে কেন —যেখানে আমরা জানি, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মানসিকতার উপর ভিত্তি করে আমাদের পরস্পরের মতপার্থক্য আছে, তা একেবারে নিঃশেষিত হয়নি, সেখানে মতপার্থক্য ঘটতেই পারে। তাহলে আমাদের এবং সমস্ত দেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদেরই একটি অবশ্যকর্তব্য কাজ হল, মূল শত্রুর বিরুদ্ধে একটা অভিন্ন কর্মপন্থা স্থির করা। এখানে পারস্পরিক বৈরিতার স্থান কোথায়? ভিয়েতনাম সংগ্রামের কথাই ধরুন। সেখানকার কমিউনিস্টদের সঙ্গে বৌদ্ধদের নৈতিক ও দর্শনগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শুরু করে প্রতি ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট তৈরি করে আমেরিকার বিরুদ্ধে, তার পূর্বে ফরাসি ও জাপানি শাসকদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই চালিয়েছে। মতপার্থক্য কি তাদের মধ্যে ছিল না? তাহলে কেউ যদি বলে, অমুকের সাথে মতপার্থক্য আছে বলে একত্রে চলা যাচ্ছে না, তার সাথে আমার ঐক্য হতে পারে না, কারণ সে সুবিধাবাদী, তাহলে কি সেটা সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি হবে? তাই জটিলতা যাই থাকুক, আমাদের মনোভাব হবে, আমাদের মধ্যে যেমন শত্রুতার মনোভাব নেই, তেমনি আদর্শগত সংগ্রামে কোনও আপস নেই। যার বিরুদ্ধেই হোক, আদর্শগত সংগ্রামে আমি এক ইঞ্চি জায়গা ছাড়ব না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কী ভাবে ঐক্য রাখতে হয়, তা আমি জানি এবং রক্ষা করে চলি। অর্থাৎ, ঐক্যবদ্ধ হয়ে কর্মপন্থা নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরস্পর মতপার্থক্যের সংগ্রামটা কেমন হবে? সেটা কি সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, দেশের স্বাধীনতার শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের মতো হবে? না, তা নয়। মতাদর্শগত ক্ষেত্রে এই সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি হবে, মতাদর্শগতভাবে ভুল পথে যারা আছে, যেমন শোধনবাদীরা-অবিপ্লবীরা, তাদের বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রামটাই হবে প্রধান। কারণ, তারা মতাদর্শগত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে বিপ্লবটাকে বিপথগামী করছে। আবার সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদেরই সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ লড়াই চলবে।

চেতনার মানের অবনমন

চেকোস্লোভাকিয়ার ব্যাপারে সোভিয়েট শোধনবাদী নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে চীনের যে সমালোচনা, সেই সমালোচনার ভঙ্গি নিয়ে আমাদের কিছু মতপার্থক্য আছে। আমরা একথা মনে করি সোভিয়েটের শোধনবাদী নীতি আদর্শগত ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণির সমস্ত সংগ্রামকে নিরস্ত্র করে দেবে, ফলে আদর্শগত সংগ্রামে তার বিরুদ্ধে আমাদের তীব্র আঘাত করতে হবে। কিন্তু এই আঘাত করতে গিয়ে আমাদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের ঐক্য আমি ভাঙতে পারি না, তাকেও রক্ষা করতে

হবে। যেটা আমরা অনুভব করছি, তা হচ্ছে, সোভিয়েট শোধনবাদ মতাদর্শগত ভাবে খুবই ক্ষতি করছে। তার দ্বারা সাম্রাজ্যবাদের সুবিধা হচ্ছে, এটা সত্য কথা। আবার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইতে আমরা তাকে ব্যবহার করতে পারি, এটাও সঠিক কথা। এখানে সাম্রাজ্যবাদের দিকে তাকে ঠেলে দেওয়া হবে রণকৌশলের দিক দিয়ে ভুল। এ হল অতি সরলীকৃত দৃষ্টিভঙ্গি। এ যথার্থ বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি নয়। বর্তমান দ্বন্দ্বগুলিকে মোকাবিলা করে জটিল সমস্যার গভীরে এর দ্বারা পৌঁছানো যাবে না। আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনে এ এক সমস্যা। তাই আমি যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, তা হচ্ছে, মতপার্থক্য চীন ও সোভিয়েটের মধ্যে আছে, খুবই মতপার্থক্য আছে। কিন্তু তা আছে বলেই যতক্ষণ দুটো রাষ্ট্রই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে আছে, ততক্ষণ তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা কেন বিঘ্নিত হবে? আবার পারস্পরিক সহযোগিতা রক্ষা করতে হবে বলে আদর্শগত সংগ্রামে আপসরফা করব, এটাও যেমন ঠিক নয়, তেমনি আদর্শগত সংগ্রাম জোর চালাচ্ছি বলে সাম্রাজ্যবাদীদের উল্লসিত করে ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে দেব, এটাও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নয়। অথচ আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এটাই ঘটছে। এর অর্থ কী দাঁড়ায়? আমাদের বহু ডকুমেন্টে আমরা একথা বারবার বলেছি যে, কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সংগঠনের প্রচণ্ড প্রসার ও উন্নয়ন হওয়া সত্ত্বেও, এমনকী বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হওয়ার পরও এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর চমৎকার সাংগঠনিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সত্ত্বেও চেতনার মানের যথেষ্ট অবনমন ঘটেছে। অর্থাৎ আদর্শগত, রাজনীতিগত, সংস্কৃতিগত চেতনার মান বাড়েনি, বরঞ্চ তুলনামূলকভাবে আরও কমে গেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেক হয়েছে, সোভিয়েট ইউনিয়নে বা অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে যথেষ্ট অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে, কিন্তু সংস্কৃতিগত-মতাদর্শগত ক্ষেত্রে অবনমন রোখা যায়নি।

মার্কসবাদ তো অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদ নয়। লেনিন থেকে শুরু করে বড় বড় মার্কসবাদীরা এটা বারবার উল্লেখ করেছেন। বিচারের প্রশ্নে 'বেস' বা সমাজের বাস্তব ভিত্তি 'প্রায়র' বলে অর্থনীতিকে মূল ধরা হয়েছে। কিন্তু একথার মানে এই নয় যে, অর্থনৈতিক বিষয় পাল্টাবার সাথে সাথে আচরণ সংক্রান্ত নানা বিষয় বা সাংস্কৃতিক-নৈতিক সংক্রান্ত বিষয়গুলো আপনা-আপনি পাল্টে যায়। ফলে অর্থনীতিটাকে জোরদার করতে পারলেই এগুলি আপন নিয়মে উন্নতি করতে থাকবে — তা নয়। এ দুটোর সম্পর্ক পরস্পর দ্বন্দ্বমূলক। অর্থনৈতিক উন্নয়নকেও একটানা জোরদার করতে পারি না, যদি সাংস্কৃতিক এবং আদর্শগত মানটা তার সঙ্গে সমান তালে সঙ্গতি রেখে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে সংগ্রাম করতে করতে উন্নতি না করে। তা না হলে কী হয়? একতরফা অর্থনীতিকে জোরদার

করতে গেলে একসময় অর্থনৈতিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হবে, আর এগোতে পারবে না, তা সংকটের সৃষ্টি করবে। সেজন্য লেনিনকেও একটা সময়ে সাংস্কৃতিক বিপ্লব, অর্থাৎ আদর্শগত মানকে উন্নততর করার কথা জোরের সঙ্গে বলতে হয়েছে। মানুষ যখন শুধু তার সংগঠনকে দেখছে, শুধু তার সংঘশক্তিকে দেখছে, অথচ রাজনীতিগত দিকটিকে অবহেলা করছে, তত্ত্বগত দিকটিকে একদম অবহেলা করছে, লেনিন তার বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। আর একটা বিষয় দেখুন, লেনিন একবারও বলেননি যে, একটা পার্টি কত লোক সংগ্রহ করেছে, কীরকম তার সংগঠন, কত তার সদস্য — এর উপর নির্ভর করে সেই পার্টিটা সঠিক কি না। লেনিন কি জানতেন না, সংঘশক্তি ছাড়া, সংগঠন ছাড়া, জনসাধারণ ছাড়া বিপ্লব হয় না? জানতেন তো বটেই, তিনি নিজেই তো বিপ্লব করেছেন। তবু তিনি বলছেন, বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া কোনও বিপ্লবী পার্টি হতে পারে না। একটা পার্টির যদি বিপ্লবী তত্ত্ব না থাকে, তাহলে অনেক লম্ফঝম্ফ করেও, অনেক সভ্য সংগ্রহ করেও সে তাসের ঘরের মতো ভেঙে যায়। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি ১৯২৪ সালে ইউরোপের বৃহত্তম পার্টি ছিল, সবচেয়ে শক্তিশালী পার্টি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, শ্রমিকশ্রেণির উপর যার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল, এমন একটা জঙ্গি পার্টি কীভাবে শেষ হয়ে গেল ফ্যাসিবাদের আক্রমণের সামনে। প্রতিবিপ্লবী আক্রমণের সামনে সে দাঁড়াতেই পারল না। ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির ত্রিশ লক্ষ সদস্য আজ যে কারণে জঙ্গলে বাস করছে। ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য-সমর্থক-স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে ত্রিশ লক্ষ নয়, খোদ পার্টি সদস্যই ছিল ত্রিশ লক্ষ। সেনাবাহিনীর মধ্যে, সেনাপ্রধানদের মধ্যে তাদের পার্টিসদস্য ছিল। সরকারে তাদের পার্টিসদস্য ছিল, মানে যাকে বলে উপচে পড়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল এবং রাষ্ট্রপ্রধানের পদেও সোয়েকর্নোর মতো এমন একজন ব্যাক্তিত্ব ছিল, যাঁর প্রভাব কী বিরাট ছিল, এদেশে জহরলালের জনপ্রিয়তা দেখেই যাঁদের মাথা খারাপ হয়ে যায়, তাঁরা কল্পনা করতে পারবেন না। তাঁর উপর মানুষের প্রবল আস্থা ছিল! তিনি নিজে সম্পূর্ণ ভাবে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা করছিলেন। সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টি তখন বলত, বিপ্লবটা কী আর এমন সমস্যা! তারা তো সরকার নিয়ন্ত্রণ করে, সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করে, নৌবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করে, প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করে, সব তাদের হাতের মুঠোয়। তারা যে কোনওদিন বিপ্লব করতে পারে। তারপর যখন পাল্টা হাওয়া এল, 'সি আই এ'-র মদতে সেনাবিভাগের কিছু কর্তাদের সঙ্গে মিলে যখন ধর্মীয় সংগঠনগুলো একটা পাল্টা আঘাত দিল, তখন গোটা পার্টিটা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল। কমিউনিস্ট পার্টি তাদের বিপুল শক্তি নিয়ে

দাঁড়াতেই পারল না।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের দুর্বলতা

অন্যদিকে দেখুন, আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের আজ কী অবস্থা ! একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলন থেকে সেদিন তা বেরিয়ে এল। বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের যেসব প্রতিনিধি সেখানে অংশগ্রহণ করেছে, তারা বলছে, তারা রাজনীতি বিশেষজ্ঞ নয়, তারা ট্রেড ইউনিয়ন বিশেষজ্ঞ। একথা বলছে কারা? বলছে যারা আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করছে। তারা বলছে, তারা ট্রেড ইউনিয়ন বিশেষজ্ঞ, রাজনীতি নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। আমাদের শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের তারা বলছে, 'তোমরা ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনে এসেছ, তোমরা এখানে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করছ কেন? তোমাদের শ্রমিক ইউনিয়নের সংখ্যা কত, কত তাদের সদস্য সংখ্যা, তোমাদের দেশে শ্রমআইন কী পাশ হল, এগুলো নিয়ে কথা বল! তোমাদের শ্রমিকদের বেতন কত, এসব ফিরিস্তি যা দেবার দাও, রাজনীতি নিয়ে তোমরা কথা বলছ কেন?' এই হল তাদের অবস্থা। মার্কসের একটা বিখ্যাত উক্তি আছে, তা হচ্ছে, ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী আন্দোলনে কাজে লাগবে না, যদি তাকে কমিউনিজম শিক্ষার স্কুল হিসাবে না দেখা হয় এবং ব্যবহার করা না হয়। শ্রমিক ইউনিয়নকে অবশ্যই কমিউনিজম শিক্ষার স্কুল হতে হবে। শ্রমিকরা তাদের দৈনন্দিন জীবনের দাবি-দাওয়ার সংগ্রামে সহজেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে মালিকশ্রেণির বিরুদ্ধে লড়তে আসে। কিন্তু কমিউনিস্টদের সেই লড়াই পরিচালনা এমনভাবে করতে হবে, যাতে মালিক আর রাষ্ট্রের সমার্থক বোধটা শ্রমিকদের দেখিয়ে দেওয়া যায়, আর অন্যদিকে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার বিস্তার যতই হোক, শুধু এই পথে যে মুক্তি আসবে না, সেইটা বুঝিয়ে দেওয়া যায়। অর্থাৎ শ্রমিকদের রাজনৈতিক চেতনা, বিপ্লবী চেতনা গড়ে তোলবার একটা হাতিয়ার হিসাবে শ্রমিক সংগঠনকে ব্যবহার করতে হবে। আর এখন ট্রেড ইউনিয়নের কর্মীরা বলছে, তারা রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় না, তারা ট্রেড ইউনিয়ন বিশেষজ্ঞ, তারা রাজনীতি বিশেষজ্ঞ নয়, রাজনীতি আলোচনা করতে হলে রাজনৈতিক দলের লোকেদের সাথে কথা বলতে হবে। শুনেছি, সেই সম্মেলনে আলাপ-আলোচনাও সেইরকম ছিল— একেবারে সাধারণ মানের, চলনসই, ছকে বাঁধা আলাপ-আলোচনা। একটা আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন, যেখানে শ্রমিক শ্রেণির আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা— সেখানেই এই অবস্থা! সেখানে আলোচ্য বিষয় হিসাবে রাজনীতি নেই। এর অতীতের চেহারা এরকম ছিল না। এই অবনতি, এটা তো একদিনে

হয়নি। দীর্ঘকাল ধরে আদর্শগত ক্ষেত্রে অবনতি হতে হতে বর্তমানে এই অবস্থা হয়েছে। ফলে সংগঠনের শক্তি বাড়লেই আদর্শগত মানটা সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে না বা অর্থনৈতিক দিকটা খুব উন্নতি করলেই সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুযায়ী সংস্কৃতিগত মানটা উন্নত হয় না। অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটলেই সংস্কৃতিগত ভাবে, নৈতিক ভাবে, রাজনৈতিক ভাবে, আদর্শগত ভাবে উন্নতি ঘটবে— এটা হল অত্যন্ত অগভীর ও সরল ব্যাখ্যা। যাঁরা এভাবে ভাবেন, তাঁরা বোঝেন না যে, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির মধ্যে, বা রাজনীতি, মতাদর্শ, জ্ঞানতত্ত্ব ও অর্থনীতির মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক রয়েছে। ফলে তারা মার্কসবাদকে অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদ করে ফেলেছে — যেটা এম এন রায়ও শেষের দিকে করে ফেলেছিলেন। কিন্তু মার্কসবাদ তা নয়। এর ফলে মার্কসবাদের কোমর ভাঙা হচ্ছে, বিপ্লবী তত্ত্ব পেছনে পড়ে যাচ্ছে, বিপ্লবী উদ্দীপনা পেছনে পড়ে যাচ্ছে। এই কারণেই এদেশে আমাদের দল আপ্রাণ চেষ্টা করছে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঝান্ডাটাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে। ব্যক্তিগত ভাবে আমিও এই বিষয়টাতে বিশেষ নজর দিই। তার কারণ হল, আমাদের দেশে সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তনের কাজটা অপূরিত রয়েছে।

বিষয়টাকে আর এক দিক থেকে আপনাদের ভেবে দেখতে বলব। আমরা সকলেই জানি, যুক্তফ্রন্টের উপর মানুষের অনেক আশা-ভরসা ছিল। কিন্তু আমরা যে কাণ্ড করছি, তাতে যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে মানুষের হতাশা বাড়ছে। এর ফলে বিকল্প কী? যুক্তফ্রন্ট এবং বামপন্থী শক্তির প্রতি মানুষের যদি হতাশা সৃষ্টি হয়, তাহলে সাময়িক একটা শূন্যতা তৈরি হবে। সেটা জনসংঘ বা ওই ধরনের ধর্মীয় মৌলবাদীরা পূরণ করবে। কিন্তু এটা তারা করতে পারবে না, যদি আমরা মানুষের সাংস্কৃতিক মানটাকে, আদর্শগত মানটাকে বিন্যস্ত করে একটা সুরে বাঁধতে পারি। কিন্তু আজকে সেই জায়গায় আমরা কী দেখছি? সি পি এম, সি পি আই পার্টির সাধারণ সমর্থক-দরদিদের, বাম এবং যুক্ত আন্দোলনের যারা সমর্থক তাদের, রাস্তায় মিছিল করতে থাকার সময় একটু লক্ষ করলেই চোখে পড়বে, তারা কীভাবে কথাবার্তা বলে। যেভাবে তারা আচার-আচরণ করে, তা অত্যন্ত নিম্নমানের। অনেক ক্ষেত্রেই তারা এমন কুৎসিত ব্যবহার করে, যেটা ভদ্র মানুষ করে না। রাজনৈতিক দলের কর্মীরা, বিশেষ করে সি পি এম দলের কর্মীরা আজ এমন হয়ে যাচ্ছে।

প্রজন্মের সংকট নয়, সাংস্কৃতিক সংকট

কাজেই যারা সংস্কৃতিগত, আদর্শগত আন্দোলনকে অবহেলা করে শুধু রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে, তাতে কাজ

হবে না। এক্ষেত্রে বাড়তি বিপত্তিটা হচ্ছে, যদি মানুষের আকাঙ্ক্ষা আমরা মেটাতে ব্যর্থ হই, তাহলে যে হতাশা আসবে, সেই পথ বেয়ে চরম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, স্বৈরতন্ত্র, ধর্মান্ধতা প্রবল বেগে ঢুকে পড়বে। তাই সংস্কৃতিগত মানকে কোনও মতেই অবহেলা করা যায় না বলেই আমরা এর উপর বিশেষ জোর দিচ্ছি। তা নাহলে বুঝতে পারা যাবে না, কেন আমরা রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, রেনেসাঁস, মানবতাবাদ, তার সঙ্গে কমিউনিজমের নীতি-নৈতিকতা, দর্শন নিয়ে এত চর্চা করছি। আমরা চাইছি, একদিকে রাজনৈতিক কর্মীদের সাংস্কৃতিক মানটাকে তোলা, আরেকটা হচ্ছে, গোটা দেশে প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের মধ্যেও এই চর্চাকে প্রসারিত করা। আপনারা লক্ষ করে দেখবেন, নেতাজির মূর্তিতে মালা দিয়ে এসেই শ্যামবাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে নেতাজির সমর্থকরা মেয়েদের উত্যক্ত করতে শুরু করে। লালঝান্ডা পার্টির লোকেরা লালঝান্ডা তুলে স্লোগান দিয়ে এসেই, লালঝান্ডা হাতে নিয়ে অন্যদের বোমা মারতে শুরু করে। ফলে আমরা একটা বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে আছি। সমাজতন্ত্রেও এই বিপদটা বুঝে চীন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কিন্তু রাশিয়ার অভিজ্ঞতা ভাল নয়। লেনিন-স্ট্যালিনের পার্টির দেশে বর্তমানে নতুন প্রজন্মের মধ্যে পশ্চিমী দুনিয়ার সংস্কৃতি, উদ্দেশ্যহীনতা, বেপরোয়াভাব জন্মগ্রহণ করছে। শুনলে অবাক হতে হয়, সমাজতত্ত্ববিদরা এবং মনোবিদরা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার যুব প্রজন্মের বর্তমান প্রবণতা উদ্বেগজনক। তারা কী করে বেড়ায়, তারই একটা চিত্র তারা দিয়েছে। তারা আর কমিউনিস্ট আদর্শে অনুপ্রাণিত হচ্ছে না। তারা লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন, বেপরোয়া হয়ে যাচ্ছে। তাদের বেশি আগ্রহ হচ্ছে, মিনি স্কার্ট পরা, মদ খাওয়া, মাতাল হওয়ার প্রতি। এই যে লক্ষ্যহীন বেপরোয়াভাব, যেটা ইউরোপের সমাজে ব্যাপক আকার নিয়েছে, আমাদের দেশে এখনও এত ব্যাপক আকার নেয়নি — এটা একটা মারাত্মক বিপদ হিসাবেই আসছে। আমাদের দেশেও মধ্যবিত্ত শ্রেণির শিক্ষিত পরিবারগুলোর যুবক-যুবতীদের মধ্যে, ছাত্রদের মধ্যে এটা ক্রমাগত বাড়ছে। এটা হচ্ছে কীসের জন্য? এর পিছনে সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক কারণ কী? মানসিক-নৈতিক-আচরণবিধি সংক্রান্ত কারণ কী? তাঁরা এর ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। ইউরোপের সামনের সারির নেতৃস্থানীয় কমিউনিস্টরা বলছেন, এটা হল 'প্রজন্মের সঙ্কট'। এঁদের মনোভাবটা হল এটাই দেখানো যে, এতে তাঁদের দায়িত্ব নেই। তাঁরা বলে থাকেন, তাঁদের প্রচুর উন্নতি হয়েছে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে। এই বলে তাঁরা যে বড়াই করছেন, এটা তাঁরা করতে পারবেন না, যদি বলা যায়, বাস্তবে এটা সংস্কৃতির সঙ্কট। কিন্তু আমি

বলব, আদতে এটা সংস্কৃতিরই সংকট, যার দায়িত্ব অবশ্যই নেতৃত্বের উপর বর্তায়। এটা দূর করা তাঁদের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। তাঁদের এই বিরাট দায়িত্ব তাঁরা পালন করছেন না। ফলে, এটা যে আদর্শগত ক্ষেত্রে, নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে সঙ্কট, তা না বলে তাঁরা বলছেন, এটা প্রজন্মের সঙ্কট। তাঁরা অতীন্দ্রিয়বাদে ডুবে রয়েছেন। আসলে এটা হল, আদর্শগত-সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে, তারই ফল। মানবতাবাদী মূল্যবোধ নিঃশেষিত হয়ে গেছে। অথচ নতুন সর্বহারা মূল্যবোধ ও চেতনা — এক, দুই, তিন, চার করে একটা নির্দিষ্ট ধারণায় আসেনি। তারই পরিণামে একটা অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। একটা উন্নত নৈতিকতার ধারণাই একমাত্র এই শূন্যস্থান পূর্ণ করতে পারে। সেটা করবে কে? কারণ, এটা যাঁদের করার কথা, তাঁরা নিজেরাই বিপ্লবের দর্শনগত, আদর্শগত, সংস্কৃতিগত দিকগুলিকে প্রতিফলিত করেন না। এই হল ইউরোপের সঙ্কট। আমাদের দেশেও এবং অন্যত্র কমিউনিস্ট প্রগতিবাদী বলে যাঁরা এই সমস্যার মধ্যে পড়েছেন, তাঁদেরও মূল সমস্যাটা এখানে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দু'টি ক্ষেত্র মিলিয়েই কথাগুলো বললাম। এইরকম সময়ে নভেম্বর বিপ্লব দিবসের তাৎপর্য এবং তার আদর্শ প্রচার করার খুবই গুরুত্ব আছে। সর্বত্র একটা হতাশা ছেয়ে আছে, প্রত্যেকেই ব্যর্থ হচ্ছে। তাহলেও পালিয়ে যাওয়ার কোনও কারণ নেই সচেতন মানুষদের পক্ষে। যাঁরা মানুষ হিসাবে বোঝেন যে, তাঁদের নৈতিক কর্তব্য কী, দায়িত্ব কী, তাঁদের পক্ষে ব্যর্থতা আসছে বলে পালিয়ে যাওয়ার কোনও যুক্তি নেই। তাহলে বিকল্প কী? বিকল্প হচ্ছে, উন্নত জীবন অর্জনের জন্য সংগ্রাম করা। তার উপায় কী? নভেম্বর বিপ্লব বলে দিল, সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের বর্তমান যুগে উৎপাদন বিকাশের এই স্তরে তাকে কেন্দ্র করে সমস্ত সমস্যা — সেটা মানুষের সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষা, বিজ্ঞান, রুচি-সংস্কৃতি, নীতি-নৈতিকতা, সেক্সের সমস্যা হোক, বা পারিবারিক সমস্যা, ভালবাসার সমস্যা হোক ইত্যাদি যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, তা সর্বক্ষেত্রে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সঙ্কটেরই প্রতিফলন। তাই পুঁজিবাদী শোষণ থেকে উৎপাদিকা শক্তিকে মুক্তি দেওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সমস্ত সামাজিক, বৈজ্ঞানিক, এথিক্যাল শক্তিগুলিকে মুক্তি দিতে হবে অত্যাচার থেকে, সঙ্কট থেকে, বিভ্রান্তি থেকে, স্বার্থপরতা থেকে এবং এই বিপ্লবটাই হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। তাই বিপ্লব মানে একটা দলের বিরুদ্ধে আরেকটা দলের শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের ব্যাপার নয়। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রশ্নটা এই বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র এইজন্য যে, একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং তার উপরিকাঠামো হিসাবে সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, নৈতিকতা সমস্ত ক্ষেত্রে

যে সঙ্কট বিরাজ করছে — সমস্তটাই এই শোষণমূলক ব্যবস্থাটির দ্বারা বা রাষ্ট্রযন্ত্রটির দ্বারা সুরক্ষিত। তাই রাজনৈতিক বিপ্লব এবং রাজনীতি হল এর মুখ্য কেন্দ্রবিন্দু। তাই যাকে আমরা সচেতন মানুষ বলি বা যিনি বিপ্লবী, তিনি অরাজনৈতিক হতে পারেন না, পার্টি বহির্ভূত মানুষও হতে পারেন না। এটা যদি কারও হয়, তাহলে বুঝতে হবে, তাঁর বিপ্লবের চেতনা ভাসা ভাসা। কারণ বিপ্লবের সঠিক চেতনার নির্দিষ্ট প্রকাশ, বিপ্লবের সঠিক উপলব্ধি তাঁর মধ্যে থাকলে তিনি দেখতে পেতেন যে, বিপ্লব হচ্ছে এই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে নতুন রাষ্ট্রশক্তির জন্ম দেওয়া, পুঁজিপতিদের মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য থেকে উৎপাদিকা শক্তিকে মুক্তি দেওয়া, উৎপাদন-সম্পর্ককে পাল্টে একটা নতুন উৎপাদন-সম্পর্ক সৃষ্টি করা। যে আধারের উপর সংস্কৃতি, রুচি, নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে এবং যৌনতা সংক্রান্ত নীতি-নৈতিকতা এবং পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমস্ত সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে — সেই আধারকে পাল্টে দেওয়া। তাহলে একটা নতুন সুন্দর পরিবেশ গড়ে উঠবে। এজন্যই আমরা বলি, শিল্প-বিজ্ঞান-শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-পারিবারিক সম্বন্ধ-ভালবাসা-সেক্স সমস্ত কিছুকেই অবিচার থেকে, বিভ্রান্তি থেকে, সঙ্কট থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই এই বিপ্লব। আর এটা উৎপাদনকে পুঁজিবাদী মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত করার প্রশ্নটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উদযাপন এসেছে এই চেতনা থেকে।

যুক্ত আন্দোলন অপরিহার্য

দ্বিতীয়ত, অন্যরা সুবিধাবাদী বলে তাদের সাথে ঐক্য হতে পারে না, এটা কোনও বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি নয়। সুবিধাবাদ কথাটাও আপেক্ষিক। বিপ্লবের বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব বলছে, মার্কসবাদী বিপ্লবীদের কাজকর্মের ধরন এমনই যে, শেষপর্যন্ত অনেকেই শত্রু হবে। কেউ যদি প্রকৃত কমিউনিস্ট হয়, তবে তার আদর্শের সঙ্গে অন্য যাদেরই আদর্শগত পার্থক্য আছে, আসলে তা তো শ্রেণি পার্থক্য। কারণ মার্কসবাদ বলছে, একটি শ্রেণিবিভক্ত সমাজে প্রতিটি চিন্তা-ভাবনা, প্রতিটি আদর্শ, প্রতিটি চিন্তাপদ্ধতি হল শ্রেণি আদর্শ, শ্রেণি চিন্তাপদ্ধতি। ফলে যে কোনও পার্টির চিন্তা, সেটা কোনও না কোনও শ্রেণিচিন্তাকে প্রতিফলিত করছে। কাজেই পার্টিগুলো যে কোনও চিন্তার কথাই নিজেরা বলুক, এ ব্যাপারে তারা সচেতন হোক বা না হোক, কিংবা এটা তারা সঠিকভাবে বুঝে থাকুক বা না বুঝে থাকুক — কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, শ্রেণিবিভক্ত সমাজে এমন কোনও রাজনৈতিক দল থাকতে পারে না, যেটা শ্রেণির দল নয়। আবার

একথাও মনে রাখতে হবে যে, একটা সঠিক বিপ্লবী নীতির ভিত্তিতে যে কোনও দেশে একটিই শ্রমিক শ্রেণির দল থাকতে পারে। বাকি যারা শ্রমিক শ্রেণির দল বলে চলে, ইতিহাসে যতদিন পর্যন্ত না তারা শক্তিহীন হয়ে যায়, ততদিন জনসাধারণও তাদের শ্রমিক শ্রেণির দল বলে মনে করে। কিন্তু প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে তারা কি আদৌ শ্রমিক শ্রেণির দল? অথচ তারা শ্রমিক শ্রেণির দল বলে নিজেদের ভাবছে, জনসাধারণও একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এবং বহু দেশে অনেক দিন পর্যন্ত তাদেরকে শ্রমিক শ্রেণির দল বলে গ্রহণ করে থাকে। তার দ্বারা জাতিকে কতটা ক্ষতি স্বীকার করতে হয়, সেটা আলাদা বিষয়। কিন্তু এগুলো চলে। কিন্তু এই যে পার্টিগুলো ঐক্যবদ্ধ হয় শ্রমিক শ্রেণির পার্টির সাথে, সেই ঐক্যের প্রক্রিয়াটা কী হবে? প্রক্রিয়াটা এমন হবে যে, যাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ লড়াই শুরু করলাম আজ কতকগুলো ন্যূনতম কর্মসূচি নিয়ে, কিছুদূর যাওয়ার পর তার থেকে হয়তো একটা পার্টি শক্তিহীন হয়ে একেবারে প্রতিক্রিয়ার সাথে চলে গেল, আবার কিছুদূর এগোবার পর আরেকটা পার্টি প্রতিক্রিয়ার সাথে চলে গেল। আবার কিছুদূর এগোবার পর আরেকটা পার্টি চলে গেল। এইভাবে ধাপে ধাপে সমস্ত পার্টিগুলো দুর্বল হয়ে জনগণকে বিপ্লবী নেতৃত্বের হাতে সঁপে দিয়ে চলে যায় — যদি বিপ্লবীরা এই যুক্তফ্রন্টের কর্মপ্রক্রিয়াটা সঠিকভাবে বুঝতে পারে। এটা হল ঐক্য ও সংগ্রামের নীতি। এখন এই ঐক্য মানে কী? ঐক্য মানে হল, সাধারণ মানুষ সংগ্রাম করবে বা করতে চায় এবং এই পার্টিগুলো পছন্দ করুক বা না করুক, জনসাধারণ ও তাদের দলের কর্মী-সমর্থকদের প্রভাবে তাদের সেইসব সংগ্রামের মধ্যে থাকতে হয়। এবং যেহেতু সেই সংগ্রামগুলো বিপ্লবী দলকেও করতে হচ্ছে, তখন কর্মসূচির ভিত্তিতে বিপ্লবী দলকে তাদের সাথে একত্রে যেতেই হবে। এই লড়াইটা চালাবার প্রক্রিয়ার মধ্যেই আসলে অন্য দলগুলির আদর্শগত দেউলিয়াপনাটা ধরা পড়বে, যদি প্রকৃত বিপ্লবী দল তার মধ্য দিয়ে কে কোন শ্রেণির দল তা দেখাতে পারে। তাই এটা হচ্ছে, ঐক্য ও সংগ্রামের নীতি। ঐক্য মানে হল, সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ যুক্ত আন্দোলন।

সবাই শত্রু, এভাবে বিচারটা ভুল। যাদের সাথে আমার পার্থক্য আছে, তাদের সাথেই আমার দ্বন্দ্ব আছে, একথা ঠিক। কিন্তু মার্কসবাদীরা এই দ্বন্দ্বের দুটো রূপ দেখে থাকে। একটা হল, যাকে আমি মূল শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করেছি তার সাথে দ্বন্দ্ব। অর্থাৎ আজকের এই অবস্থায় বিপ্লব করতে হলে এই সমাজটার মধ্যে যে শ্রেণিশত্রুটাকে বা যে জোটটাকে ক্ষমতা থেকে হঠাতে হবে, রাষ্ট্রকে যারা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে, যারা অর্থনৈতিক,

রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে বিপ্লবের পক্ষে প্রধান বাধা — তারাই হচ্ছে প্রধান শত্রু। এইজন্য মূল শত্রু কথাটা বলা দরকার এবং লড়াইয়ের মূল লক্ষ্য তার বিরুদ্ধে হওয়া উচিত। সমস্ত শত্রুকে একসাথে মোকাবিলা করে নির্বোধরা। ফলে লড়াইয়ের প্রক্রিয়াটা বুঝতে হবে এবং তা গ্রহণ করতে হবে। অন্য দলগুলির সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মূল শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রক্রিয়ায় এক এক করে জনসাধারণের মধ্যে থেকে অন্যান্য দলের প্রভাব বিচ্ছিন্ন করতে হবে। এই কাজটি করার জন্য সঠিক পদ্ধতি নিতে গিয়ে ভুল করলাম, ল্যাজে-গোবরে হয়ে গেলাম, সমঝোতা করে ফেললাম, আদর্শই হারিয়ে ফেললাম, সুবিধামতো সরে গেলাম — এটা আলাদা বিষয়। কিন্তু যেহেতু বিভিন্ন পার্টির মধ্যে সুবিধাবাদ আছে, তাই তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ লড়াইতে যাব না, এটা ভুল। তাদের মধ্যে সুবিধাবাদ রয়েছে, থাকবেই তো। তাই এই কথা তোলা হচ্ছে, একটা অহেতুক প্রশ্ন তোলা। কারণ তার মধ্যে সুবিধাবাদ না থাকলে সে তো বিপ্লবী দলই হত। আলাদা করে একটা বিপ্লবী দল গঠন করার প্রয়োজনই হত না। সুবিধাবাদের চর্চা অন্য দলগুলো তো করবেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা এখনও জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করে। জনগণকে তাদের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে না পারলে শুধু তোমার স্বপ্নের দ্বারা তুমি বিপ্লব করতে পারবে না। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মোহ এবং প্রভাবের জন্য জনতার উপর এইসব পার্টিগুলোর প্রভাব আছে এবং বিরাট জনসাধারণ এইভাবে বিপ্লবী দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। আমাদের মনে রাখা দরকার, আমরা যাকে প্রধান শত্রু বলে চিহ্নিত করেছি, অন্য পার্টিগুলোও তাদের নিজ নিজ স্বার্থে সেই একই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছে। সেটা তাদের পার্লামেন্টারি স্বার্থে হতে পারে, স্থানীয় স্বার্থে হতে পারে, কেরিয়ারের স্বার্থে হতে পারে, বা তাদের সংগঠন এবং জনতার উপর তাদের প্রভাব রাখার জন্য যতটুকু পর্যন্ত তারা লড়তে বাধ্য হয়, তার জন্য হতে পারে। সেইখানে তাদের সাথে বিপ্লবী দলের ঐক্য হবে। কারণ গণতান্ত্রিক দাবি-দাওয়া নিয়ে এই লড়াইটা এড়িয়ে গিয়ে আমিও বিপ্লব করতে পারছি না বা বিপ্লবের ভাবনাটা বা সংগঠনটা যেমনভাবে গড়ে তুলতে চাইছি, তেমনভাবে গড়ে তুলতে পারছি না। তাই ঐক্য হবে। এটাকে আমরা বলি, সাধারণ ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্য।

দ্বন্দ্বের চরিত্র নির্ধারণ মূল প্রশ্ন

তাহলে দেখা যাচ্ছে, যাদের সঙ্গে প্রকৃত বিপ্লবী দলের বিরোধিতা আছে, তাদের মধ্যে একটা হচ্ছে মূল শত্রুর সঙ্গে বিরোধিতা। এটা হল মূল শত্রু এবং বিপ্লবী দলের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। আরেকটা হচ্ছে সেই মূল শত্রুর বিরুদ্ধে অন্য

দলগুলো যারাই লড়ছে, তাদের সঙ্গে বিপ্লবী দলের দ্বন্দ্ব। এই দ্বিতীয় ধরনের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে বিপ্লবী দলের কর্তব্য হচ্ছে, তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একদিকে জনসাধারণ থেকে সেই সমস্ত দলকে বিচ্ছিন্ন করা, অপরদিকে তাদের প্রভাবাধীন জনতাকে বিপ্লবী আদর্শের প্রতি আকর্ষণ করা। ফলে এ দুটোকে এক করে দেখা চলে না। কিন্তু কাঁচা বিপ্লবীরা প্রায়ই এরকম ভুল করে বসে। উগ্র সমর্থকরা দ্বন্দ্বের এই চরিত্রটাকে অনেক সময় আলাদা করতে পারে না। ফলে সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক হঠকারিতা হয়ে যায়। বিপ্লবের পক্ষে তা ক্ষতিকারক হয়ে যায়। বিপ্লবী শিবিরে লোক সংগ্রহের পরিবর্তে বিপ্লবী শিবিরকে আমরা নিজেরাই ভেঙে ছত্রখান করে দিই এবং প্রতিক্রিয়াশীলরা তার সুযোগ নেয়। যে মূল শত্রুর বিরুদ্ধে বিপ্লবীর সংগ্রাম, সেই মূল শত্রু এর সুযোগ নেয়। এইভাবে জার্মানিতে সমাজবাদীরা, কমিউনিস্টরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে ফ্যাসিবাদ ডেকে এনেছিল। এইভাবে বিভিন্ন দেশে বিপ্লবীরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বের চরিত্র নির্ধারণ করতে পারেনি। এটা অবিপ্লবীদের পারার কথা নয়। কিন্তু যারা নিজেদের বিপ্লবী বলে, এক্ষেত্রে মূল দায়িত্বটা তাদের উপরই আমি দেব। কারণ, আমি যখন জানছি, অন্য পার্টিগুলো বিপ্লবী পার্টি নয়, মার্কসবাদী নয়, তখন এই অভিযোগ তোলার কোনও মানে হয় না যে, ওরা ঐক্য ভাঙছে। তারা তো ঐক্য ভাঙবেই। এটা তো সেই ব্রিটিশ আমলের মতো কথা হল যে, ব্রিটিশরা বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন করেছে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য রাখতে দেয়নি, তার জন্যই আমাদের দেশে দাঙ্গা হয়েছে। এটা হল অযোগ্য নেতৃত্বের কথা, যারা সমস্যার ভেতরে ঢুকতে পারেনি, সমস্যাকে ঠিকমতো ধরতে না পেরে নিজেদের দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে দিতে চেয়েছে। ব্রিটিশ কি আমাদের বলবে যে, হিন্দু-মুসলমান তোমাদের মধ্যে যে অনৈক্য আছে, এসো আমি তোমাদের ঐক্যবদ্ধ করে দিই, যাতে স্বাধীনতা আন্দোলনে তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করে আমাকে তাড়াতাড়ি উৎখাত করতে পার? শাসক হিসাবে তারা তাদের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেছে, যদি সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, তারা তাদের নীতিকে সঠিকভাবে রূপায়িত করেছে। তারা বিভেদ নীতির উপর কাজ করেছে, তারা ধর্মীয় ভাবাবেগকে ভিত্তি করে বিভেদ নীতি সৃষ্টি করেছে। অথচ, আমরা যারা সে সময় গণতান্ত্রিক বিপ্লবী ধারার অগ্রগামী সৈনিক, তারা সেই সমস্যাটায় না ঢুকে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে ব্রিটিশদের দায়ী করে আমাদের দায়িত্ব স্খালন করেছি। আর কেবল 'ঐক্য চাই, ঐক্য চাই, আমরা সবাই ভাই ভাই' বলে ওপর ওপর আবেদন করেছি। তাতে কাজ হয়নি, হচ্ছেও না। এর অর্থ হল, সমস্যাটা অন্য জায়গায়। সেই আলোচনায় এখানে আমি যাচ্ছি না। অন্য

বহু জায়গায় ওই বিষয়গুলো আমি আলোচনা করেছি।

একটা দেশে একটাই প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি থাকতে পারে

পশ্চিমবাংলায় একটা ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টে আমরা এসেছি, সব পার্টিই এসেছে। তারা একথা বলেই আমাদের সাথে এসেছে যে, আমাদের পার্টির সাথে তাদের মতপার্থক্য আছে। তারা মনে করে, আমাদের পার্টি সুবিধাবাদী পার্টি। আমাদের পার্টিও এটা জেনেই যাচ্ছে যে, সি পি এম, সি পি আই, আর এস পি প্রমুখ দলগুলো মেকি, নকলনবিশ মার্কসবাদী দল। তারা ভারতবর্ষে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তো বটেই, এমনকী রাজনৈতিক নৈতিকতা শুধু নয়, সমস্ত নীতি-নৈতিকতাকেই নষ্ট করে দিয়েছে। তাদের সাথে আমাদের মতপার্থক্য আছে বলেই আমরা আলাদা পার্টি গঠন করেছি। তবুও যাচ্ছি তাদের সাথে ঐক্যফ্রন্টে। তাদের সঙ্গে আমাদের মতভেদ আছে বলে নকশালদের মতো আমরা বলছি না যে, যেহেতু তাদের ধারণার সাথে আমাদের ধারণার মিল নেই, সেইহেতু তারা সুবিধাবাদী, তাদের সাথে একত্রে চলা যায় না। আমরা এই রাজনীতিকে ভ্রান্ত রাজনীতি মনে করি। আবার একত্রে যাওয়ার পর যখনই কোনও মতপার্থক্য দেখা দেবে, তখনই বলব, ওরা সুবিধাবাদী, সেইজন্যই কিছু হচ্ছে না, ওদের সাথে আর একত্রে থাকা চলে না — না, তা নয়। এই একই কথা সি পি এমের ক্ষেত্রে, সি পি আইয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যদি তারা তাদের বিশ্বাসের প্রতি যথার্থই সৎ হত, তাহলে তারা বিশ্বাস করত এবং তাদের মতো করে মনে করত, অন্যরা সুবিধাবাদী পার্টি, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কথা বলে, কিন্তু মার্কসবাদী নয়। কিন্তু তাদের নিয়ে মুশকিল হল, তারা যেভাবে বলে, তাতে স্পষ্ট করে কিছু বোঝা যায় না। এই তো জ্যোতিবাবুর বক্তৃতা শুনলাম, বিশ্বনাথবাবুর বক্তৃতাও শুনেছি। এসব শুনে মনে হয়েছে, তাঁরা মনে করেন, যারা তাঁদের মতো মার্কসবাদী পার্টিকে সমর্থন করে, তারাও মার্কসবাদী। আর সমর্থন না করলে তারা মার্কসবাদী নয়। তাদের সমর্থন আমরা করলে আমরাও মার্কসবাদী পার্টি, আর এস পিও মার্কসবাদী পার্টি, মার্কসবাদের নাম নিয়ে যারা চলে তারা সবাই মার্কসবাদী পার্টি। অর্থাৎ তাদের অভিমত ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায়, একটা দেশে একই সঙ্গে সত্যিকারের পাঁচটা মার্কসবাদী পার্টিও থাকতে পারে। ফলে তারা আমাদের পার্টি সম্পর্কে মনে করে, আমরা সত্যিকারের কমিউনিস্ট হলে কি আর ওদের মতো কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করতে পারি! কিন্তু আমাদের আসল প্রশ্নটাই অন্যরকম। আমাদের প্রশ্ন তো হচ্ছে, তারা আদৌ মার্কসবাদী কি না, কমিউনিস্ট কি না? তারা যে নিজেদের কমিউনিস্ট বলছে, আমরা তো সেইটেই অস্বীকার

করে বসে আছি। উত্তর করতে চাইলে, আগে এই প্রশ্নটার উত্তর করতে হবে।

বিপ্লবের শত্রু-মিত্র ঠিক করা

এখানে আর একটা কথা আপনাদের আমি বলে যেতে চাই। আপনারা জানেন, একটা সমাজের মধ্যে হাজার এক রকমের দ্বন্দ্ব আছে। কিন্তু প্রত্যেকটা দ্বন্দ্বেরই কি একই মূল্য, একই গুরুত্ব? প্রত্যেকটা দ্বন্দ্বকেই সমান গুরুত্বপূর্ণ মনে করে কি কোনও বিপ্লব পরিচালনা করা যায়? যায় না। সেইজন্যই দ্বন্দ্বগুলোর মধ্যে আবার দ্বন্দ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটিকে বের করতে হবে, অর্থাৎ প্রধান দ্বন্দ্বটাকে আগে নির্ধারণ করতে হবে। এরই নাম হল, প্রথমত, বিপ্লবের প্রধান শত্রু কে, তা ঠিক করা। দ্বিতীয়ত, এর সাথে বিপ্লবী শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিপ্লবের মিত্র কারা, ঠিক করতে হবে। মার্কসবাদী পরিভাষায় একে বলা হয়, শক্তির সমন্বয়, অর্থাৎ বিপ্লবের মিত্র (correlation of forces, allies of revolution) কারা, তা নির্ধারণ করা। এর মানেই তো হচ্ছে, বিপ্লবের মিত্রদের মধ্যে বিচিত্র ধরনের বহু শক্তি থাকবে, যারা শেষপর্যন্ত বিপ্লবে যাবে না, তাদের নিয়েই গোটা বিপ্লবের প্রক্রিয়াটা চলবে। তাদের নিতে হবে কেন? কারণ প্রতিক্রিয়ার শক্তির হাতিয়ার হিসাবে তারা কাজ করবে, যদি বিপ্লবী দল তাদের টানতে না পারে। নাহলে বিপ্লব জয়যুক্ত হবে না। শুধু আদর্শের জোরে, ইচ্ছার জোরে এটা হবে না। বিপ্লবের একটা মৌলিক সমস্যা হল, বিপ্লবী শক্তি এবং বিপ্লব বিরোধী যে মূল শত্রু, এই দু'য়ের মাঝখানে রয়েছে বিরাট জনসাধারণ। তারা কার সমর্থক শক্তি হবে? তারা বিপ্লবের সমর্থক শক্তি হবে, না কি বিপ্লব বিরোধী শক্তির সমর্থক হবে? তাহলে বিপ্লবের সমর্থক (reserve) শক্তি হিসাবে তাদের পাওয়ার জন্যই এটা নির্ধারণ করা সর্বত্র বিপ্লবের অঙ্গ। 'জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতার' জন্ম দেওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটি শ্রমিক শ্রেণির দলের নেতৃত্ব বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে এটা অবশ্যকর্তব্য। জনগণের বা শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন সংগঠন বলতে আমরা যা বুঝি, ভারতবর্ষে কারও সংগ্রামের মধ্যেই আমরা তা গড়ে তোলার কার্যক্রম দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের তরফ থেকে তার একটা আয়োজন হচ্ছে, একটা সত্যিকারের চেষ্টা হচ্ছে, একথা বলতে পারি।

এ যুগে বিপ্লব বহু সূত্রে জড়িত

তৃতীয়ত, নভেম্বর বিপ্লব আর একটি শিক্ষাও দিয়ে গেল। তা হচ্ছে, এ যুগে বিপ্লব বহু জায়গায় বহু সূত্রে জড়িত এবং এই শিক্ষাটাকে মনে রাখতে হবে।

লেনিন যে সময় বিপ্লব করেছেন, সেটা হল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্বহারা বিপ্লব, ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের যুগ। কিন্তু তখনও এমন সব দেশ ছিল, যারা সাম্রাজ্যবাদ বা সামন্ততন্ত্র হটিয়ে স্বাধীন পুঁজিবাদী রাষ্ট্র গঠন করতে পারেনি, অথবা পুঁজিবাদী অর্থে পিছিয়ে-পড়া দেশ। সেইসব দেশগুলোতে বহু জায়গায় বিপ্লব পুরনো সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বা সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবের স্তরে ছিল। কিন্তু এ যুগে সমস্ত বিপ্লবই প্রকারান্তরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অঙ্গ। লেনিনের সময় লেনিন বুর্জোয়াদের জাতীয় বুর্জোয়া বলে ভাগ করতেন না। তিনি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে উপনিবেশগুলিতে কমিউনিস্টদের বুর্জোয়া ডেমোক্রেসির সাথে সাময়িক মৈত্রী করার কথা বলেছিলেন। এর পরে প্রথমে স্ট্যালিন ও পরে মাও সে-তুং-এর সময় থেকে জাতীয় বুর্জোয়া কথাটা আলাদা করে বলা হয়। তখন বুর্জোয়াদের আপেক্ষিক অর্থে খানিকটা প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল। এই ভূমিকাটির মধ্য দিয়ে চলতে চলতে বুর্জোয়ারা যদি ক্ষমতা অর্জন করে ফেলে, তখন আর্থ-সামাজিক অর্থে পিছিয়ে-পড়া দেশের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব তখনও সম্পূর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় গিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করলে সেই পরিস্থিতিতে বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে প্রবেশ করল। এ যুগে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হোক, স্বাধীনতার সংগ্রাম হোক, তা শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে না হলে অর্ধপথে সমাপ্ত হবে, আধসেঁকা রুটির মতো কাটছাঁটের পথে হবে, তা চূড়ান্ত সমাপ্তিতে যেতে পারবে না। এ যুগে পিছিয়ে-পড়া (আন্ডারডেভেলপড) দেশের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবও আন্তর্জাতিক সর্বহারা বিপ্লবের অংশবিশেষ। যেখানে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অঙ্গ হিসাবেই সব বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবগুলো বিরাজ করছে, সেখানে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবগুলো একসূত্রে গ্রথিত (interwoven) হয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে মিশে আছে, একেবারে মিশে আছে। এটা পরপর হয়ে যাবে, কি একই সঙ্গে হয়ে যাবে, বা করে ফেলতে হবে — সেটাকেও লক্ষ করতে হবে। অর্থাৎ, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ঐতিহাসিক স্তরটা এই জায়গায় এসে ওই স্তরটা পার করে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক স্তর শুরু করল কি না, সেটাও লক্ষ করতে হবে। এতটা পর্যন্ত পুরো স্তরটাই স্তরের অর্থে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক। কিন্তু সেটা কি একই স্তরের? ভ্রূণের স্তরে, প্রাথমিক স্তরে, উন্নয়নের স্তরে এবং চরম স্তরে পৌঁছে একদম শেষপর্যন্ত চূড়ান্ত বিকাশে যাবে কি না, সেটা নিয়ে কি ঢালাও বিচার করা যায়? না, তা নয়। বিশেষ করে এ যুগে তা আর সম্ভব নয়। এটাও বিচার্য বিষয়। লেনিন তার এপ্রিল থিসিসে দেখিয়েছেন, ফেব্রুয়ারিতে যেখানে কেরেন্‌স্‌কি সরকার

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অঙ্গ হিসাবে ক্ষমতায় এল, তার দু'মাসের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর নির্ধারিত হল এবং বুর্জোয়া বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে একসূত্রে গাঁথা হয়ে থাকল, ডেরিভেটিভ (derivative) হয়ে থাকল।

সি পি আই, সি পি আই (এম) ও নকশালদের বিভ্রান্তি

এইসঙ্গেই সি পি আই, সি পি এম এবং নকশালদের প্রত্যেকের রাজনীতিকে সামনে রেখে একটি কথা আলোচনা করা দরকার। যদিও বর্তমানে নকশালদের সঙ্গে সি পি আই, সি পি এমের বিপ্লবের মূল লক্ষ্য, মূল শত্রু, বিপ্লবের উদ্দেশ্য, এবং বিপ্লবের শক্তিগুলি সমন্বয়িত হওয়ার প্রশ্নে, অর্থাৎ শ্রেণি বিন্যাসের প্রশ্নে কোনও পার্থক্য নেই, তবুও রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে। কিন্তু সেই পার্থক্যটুকুও সি পি আই, সি পি এম এই দুই পার্টির মধ্যে নেই। দলের কর্মীদের মার্কসবাদ সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান না থাকার ফলে, অধুনা যুক্ত হওয়া নতুন কর্মীদের সি পি এম বচনের পার্থক্যের দ্বারা দেখাবার চেষ্টা করছে যে, সি পি আই শোধনবাদী, আর তারা বিপ্লবী। কিন্তু বাস্তবে বিচার করলে দেখা যাবে, তত্ত্বগতভাবে তাদের দুই পার্টির মধ্যে কোনও পার্থক্যই নেই।

এই দুটো পার্টিই বলছে, বিপ্লবটা হবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী। এবিষয়ে দুই পার্টির কোনও পার্থক্য নেই, বুঝে নিন। সি পি আই-এর মতো সি পি এমও বলছে, বিপ্লবের লক্ষ্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সামন্ততন্ত্রবিরোধী। সি পি এম একথা বলছে না যে, বিপ্লবটা হবে পুঁজিবাদবিরোধী। সি পি আইও সেকথা বলছে না। তাদের দুই পার্টিরই মতে বিপ্লবের উদ্দেশ্য হল, সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ করা। এখানে আরেকটি কথাও মনে রাখতে হবে, পার্টির মূল নীতি ঠিক আছে কি না, তা কী দিয়ে ঠিক হবে? ঠিক হবে পার্টির মূল রণনীতি দিয়ে— অর্থাৎ বিপ্লবের স্তর সম্পর্কে পার্টির ধারণা ঠিক আছে কি না তা দিয়ে। সমাজ সম্পর্কে বিশ্লেষণ, অর্থনীতির স্তর সম্পর্কে বিশ্লেষণ, রাষ্ট্রের শ্রেণিচরিত্র বিশ্লেষণটা মূলগতভাবে বোঝা ঠিক হচ্ছে কি না তা দিয়ে। তা বাদ দিয়ে, খুঁটিনাটি ব্যাপারে, স্লোগানের ব্যাপারে, কৌশলের ব্যাপারে কে কী শব্দ ব্যবহার করল তা দিয়ে পার্টির মূলগত চরিত্র ঠিক হয় না কি? না, তা হয় না। বিপ্লবের স্তর নির্ণয়, অর্থাৎ সমাজের মূল অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, রাষ্ট্রের চরিত্রের মূল বিশ্লেষণ, বিপ্লবের উদ্দেশ্য কী, বিপ্লবের প্রধান শত্রু কে — এগুলো নির্ণয়ই হল বিপ্লবের মূল বিষয় এবং সেইসব ক্ষেত্রে দেখবেন, সি পি আইয়ের সাথে সি পি এমের কোনও পার্থক্য নেই। তাই আমরা বলি, সি পি আই-কে শোধনবাদী

বলাটা সি পি এমের ক্ষেত্রে হল দলগত নেতৃত্ব রক্ষার জন্য, গ্রুপবাজি রক্ষার জন্য কৌশলের ক্ষেত্রে কতগুলো শব্দগত চালাকি সৃষ্টি করে সাধারণ স্তরের কর্মীদেরকে সবসময় গরম করে রাখার চেষ্টা। সি পি আই শোধনবাদী, একথা ঠিক। কিন্তু সি পি এম তো সি পি আই থেকেও আরও জঘন্য শোধনবাদী। মৌলিক নীতিতে দু'জনের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। দু'জনেই সমান। কারণ, প্রথমত, দু'জনেই বলছে, বিপ্লবটা পুঁজিবাদবিরোধী নয়, বিপ্লবটা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী-সামন্ততন্ত্রবিরোধী। দ্বিতীয়ত, দু'জনেই বলছে, ভারতবর্ষের জাতীয় বুর্জোয়ারা এই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী- সামন্ততন্ত্রবিরোধী জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মিত্রশক্তি, দোদুল্যমান মিত্রশক্তি। দু'জনেরই মৌলিক ব্যাখ্যা এক, কোনও পার্থক্য নেই। কিন্তু সি পি এম যখন পার্টি ভাগ করে আলাদা হয়, তখন আশ্চর্যজনক ভাবে ক্রুশ্চেভের একটা থিসিসকে ঘিরে তাদের পার্থক্য ঠিক করল। তাদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী-সামন্ততন্ত্রবিরোধী বিপ্লবে বুর্জোয়াদের একটা সহকারী ভূমিকা আছে, এই বিষয়ে দু'দলই একমত। শুধু সি পি আই বলছে, সেই বুর্জোয়াদের সঙ্গে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠন করে যুক্তভাবে গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে তারা শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব হাসিল করবে। তাদের মতে এটা কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি। অর্থাৎ, জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে মৈত্রী করে তাকে ব্যবহার করে তারা শান্তিপূর্ণভাবে বিপ্লব ঘটাবে। আর সি পি এমও তাদের কলকাতা কংগ্রেসে বলল যে, শান্তিপূর্ণভাবে বিপ্লবের সম্ভাবনা আছে এবং তারাও সেই চেষ্টাই করছে, এতে তাদের আপত্তি নেই। কিন্তু এই বুর্জোয়াদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ ভাবে জাতীয় ফ্রন্ট হবে না বুর্জোয়াদের সঙ্গে হবে ঐক্য ও সংগ্রামের নীতি, অর্থাৎ বুর্জোয়াদের যে নীতিগুলো জনগণের বিরুদ্ধে যাবে, তারা তার বিরুদ্ধে লড়বে। ভাবখানা এইরকম যে, জাতীয় বুর্জোয়ারা যখন জনগণের বিরুদ্ধে যাবে, তখন সি পি আই তাদের সঙ্গে থাকবে, আর সি পি এম তাদের বিরুদ্ধে যাবে — এইরকমই নাকি পার্থক্য। কিন্তু সি পি আই, সি পি এম দু'জনই এ ব্যাপারে একমত যে, বুর্জোয়াদের মধ্যে যারা একচেটিয়া পুঁজিবাদবিরোধী তারাই জাতীয় বুর্জোয়া এবং এই জাতীয় বুর্জোয়ারা তাদের সঙ্গে বিপ্লবের মিত্র শক্তি হিসাবে থাকবে। সি পি এমও জাতীয় বুর্জোয়াদের সম্পর্কে বলছে যে, তারা যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র এবং একচেটিয়া পুঁজিবাদ, অর্থাৎ বৃহৎ পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে। তাহলে দু'দলই বলছে, জাতীয় বুর্জোয়ারা একচেটিয়া কারবারের বাইরে। কিন্তু সি পি আই মনে করতে থাকল যে, কংগ্রেসের মধ্যে একচেটে কারবারিরা যেমন আছে, আবার জাতীয় বুর্জোয়াদের একটা অংশও আছে। গোড়ার দিকে সি পি এমও বলত — না, কংগ্রেসের মধ্যে জাতীয়

বুর্জোয়ারা নেই। কিন্তু ইদানীং নকশালদের আক্রমণের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে গিয়ে রণদিভে 'পিপলস ডেমোক্রেসি'তে গাদা গাদা প্রবন্ধ লিখে বলেছেন যে, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে টাটা-বিড়লারা, যারা কম্প্রাডর নয়, যারা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়েছিল, আজকে তারাই অর্থাৎ এই জাতীয় বুর্জোয়ারাই রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছে। অর্থাৎ কংগ্রেসের মধ্যে জাতীয় বুর্জোয়ারা আছে, তা তাঁরা স্বীকার করে নিলেন এবং এটাও স্বীকার করে নিলেন যে, বর্তমানে ক্ষমতাসীন দলে, অর্থাৎ জাতীয় কংগ্রেসে সেই বুর্জোয়ারাই আছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, নকশালরা যে বলছে, এটা হল আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র — তাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি এই ব্যাখ্যা দিলেন। তাহলে তো বলতে হয়, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা একটু বেশিই আছে, তা একেবারে নামসর্বস্ব নয়! যদি শুধু আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক বলা হয়, তাহলে তো নকশালদের সঙ্গে সি পি এমের কোনও পার্থক্য থাকে না। তাহলে তো নকশালদের মূল রাজনৈতিক তত্ত্ব তাদের মেনে নিতে হয়। আমরা তাদের বলেছিলাম যে, তারা বলছে, তারা জাতীয় বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়বে। তাই যদি হয়, তাহলে বিপ্লব মানে তো রাষ্ট্রশক্তির উচ্ছেদ। আর রাষ্ট্রটা তো জাতীয় বুর্জোয়ারাই নিয়ন্ত্রণ করছে। তাহলে বিপ্লবটা তো আর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী-সামন্ততন্ত্রবিরোধী থাকে না। তখন তারা বলে, না, না, রাষ্ট্রটা জাতীয় বুর্জোয়ারা নিয়ন্ত্রণ করছে না, করছে বৃহৎ পুঁজিপতিরা, মানে একচেটে পুঁজিপতিরা, করছে সাম্রাজ্যবাদের দালালরা। আমি বলেছিলাম, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় যারা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়েছিল তারা তো জাতীয় বুর্জোয়াই ছিল, তারাই তো আজ রাষ্ট্র ক্ষমতায়। সি পি এম সেই যুক্তিই তো আজ করছে। যদি জাতীয় বুর্জোয়ারাই ক্ষমতায় থাকে এবং তারাই রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাহলে তো বিপ্লবের কর্তব্য হল, রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে শুধু একচেটে পুঁজিপতিদেরই নয়, জাতীয় বুর্জোয়াদেরও হঠানো। ফলে জাতীয় বুর্জোয়ারা তো বিপ্লবের সাথে আসতে পারে না। তখন তারা অনেকটা মন্ত্র জপ করার মতো বলতে থাকল — বিপ্লবের লক্ষ্য হল আধা-সামন্ততন্ত্র ও আধা-সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদ করা। অদ্ভুত চূড়ান্ত স্ববিরোধিতা!

জাতীয় পুঁজি থেকে একচেটিয়া পুঁজির জন্ম

আরেকটা বড় কথা হচ্ছে, তাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী দাঁড়ায়, একচেটে পুঁজিপতিরা জাতীয় বুর্জোয়া নয়। জাতীয় বুর্জোয়া হচ্ছে ক্ষুদ্র উৎপাদনকারী, অর্থাৎ একচেটে পুঁজিপতিদের যারা বিরোধিতা করে তারা। সব দেশেই তো একচেটিয়া কারবারের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র পুঁজি আছে। ছোট পুঁজি যেমন পুঁজিবাদে আছে, তেমনি

সমাজতন্ত্রেও থাকে। এই ক্ষুদ্র পুঁজি সমস্ত দেশেই আছে, ইউরোপে-আমেরিকাতে আছে, আমাদের দেশেও আছে এবং তাদের সঙ্গে একচেটিয়া পুঁজির দ্বন্দ্ব সব দেশেই আছে। পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লব করতে গিয়ে একচেটে পুঁজির সাথে ক্ষুদ্র পুঁজির দ্বন্দ্ব কীভাবে ব্যবহার করা যায়, বিপ্লবের এটা একটা সমস্যা। কিন্তু একচেটে পুঁজিপতিরা জাতীয় বুর্জোয়া নয়, ছোট পুঁজির মালিকরা জাতীয় বুর্জোয়া — এটা মনে করা বা বলা একটা উদ্ভট জিনিস! আমি জিজ্ঞাসা করি, একচেটে পুঁজির উৎপত্তি কোথা থেকে হল? বনিকি পুঁজি নিশ্চয়ই একচেটে পুঁজি নয়। তাহলে একচেটে পুঁজি কথাটার মানে কী? কোথা থেকে এই একচেটে পুঁজির জন্ম হয়? জাতীয় পুঁজিই তো বিকাশের পথে একচেটে পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়। নাহলে একচেটে পুঁজির জন্ম হবে কী করে? মার্কসবাদ কী বলে? একচেটে পুঁজি কি আকাশ থেকে পড়ে? অদ্ভুত কথা! তারা জাতীয় বুর্জোয়া বলতে একচেটে পুঁজিপতিদের বোঝে না। অর্থনীতির ছাত্রমাত্রই জানেন, একচেটে পুঁজি হল পুঁজিবাদের বংশগত প্রবণতা। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হোক, অথবা সামন্তী সমাজের বিরুদ্ধে হোক, পুঁজিবাদ আসে একটি জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। একটি জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্ম দিতে সে চায়, যাতে করে জাতীয় পুঁজি জমিয়ে তোলা যায়, একটি জাতীয় বাজার সৃষ্টি করা যায়। জাতীয় বুর্জোয়ার তিনটি বিষয়, একটা নির্দিষ্ট সীমানাযুক্ত এলাকার মধ্যে একটি জাতীয় পুঁজির বাজার, একটা জাতীয় পুঁজির সৃষ্টি, আর একটা জাতীয় রাষ্ট্র গঠন। সেইজন্য জাতীয় বুর্জোয়াদের গোড়ার দিকে থাকে সামন্ততন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিপ্লবী। কিন্তু উদ্বৃত্ত মূল্য আহরণের মধ্য দিয়ে অতি সত্বর সে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হরণ করতে থাকে। একদিকে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হরণ করে সে বাজার সঙ্কট সৃষ্টি করতে থাকে, আর একদিকে একচেটে পুঁজির জন্ম দেয়। ক্ষুদ্র পুঁজিকে গিলে খেয়ে, অবাধ প্রতিযোগিতাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে না পারলেও তাকে নিয়ন্ত্রণ করে একচেটে পুঁজির জন্ম হয়। তাহলে জাতীয় পুঁজিই তার বিকাশের পথে একচেটে পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়। এইভাবে জাতীয় পুঁজি থেকে একচেটে পুঁজির জন্ম হয়। আমরা যে বিদেশি লগ্নিপুঁজিকে একচেটিয়া পুঁজি বলি, সেও তো ব্রিটিশ জাতীয় পুঁজির রূপান্তরিত চেহারা।

ব্রিটিশ ন্যাশনাল ক্যাপিটাল, আমেরিকান ন্যাশনাল ক্যাপিটাল আজকে ব্রিটিশ ইমপিরিয়াল ক্যাপিটালে, আমেরিকান ইমপিরিয়াল ক্যাপিটালে রূপান্তরিত হয়েছে। তার ফলে তারা সাম্রাজ্যবাদী হয়েছে, ফিনানসিয়াল অলিগার্কির জন্ম দিয়েছে, ফিনান্স ক্যাপিটালের জন্ম দিয়েছে। ভারতবর্ষেও ঠিক তাই হয়েছে। জাতীয় পুঁজি তার বিকাশের পথে অবাধ প্রতিযোগিতার অর্থাৎ 'লেজে ফেয়ার'

স্টেজ পার করে দিয়ে সংহত হওয়ার পথে মনোপলির জন্ম দিয়েছে, ফিনান্স ক্যাপিটালের জন্ম দিয়েছে এবং ফিনান্স ক্যাপিটালের জন্ম দিয়ে সে সাম্রাজ্যবাদী হয়েছে। সেইজন্যেই লেনিন বলেছেন, মনোপলি স্টেজ ফিনান্স ক্যাপিটালের জন্ম দেয়। এই ফিনান্স ক্যাপিটাল ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মাধ্যমে স্টক এক্সচেঞ্জ, খুচরো ব্যবসা থেকে আরম্ভ করে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প সবই নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের দেশের দিকে লক্ষ করুন। একটা ফিনান্সিয়াল অলিগার্কি এখন ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মাধ্যমে শস্য থেকে শুরু করে শিল্পের প্রতিটি ক্ষেত্র, ব্যবসা-বাণিজ্য সহ সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। এদেশে ব্রিটিশ শাসনকালে সিপাহি বিদ্রোহের প্রায় সমসাময়িক সময়ে ধীরে ধীরে জাতীয় পুঁজির গঠন শুরু হয়েছে। গত যুদ্ধের সময় তা সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছে একচেটিয়া পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়েছে, একচেটিয়া কারবারে রূপান্তরিত হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, ছোট একচেটে পুঁজি নয়, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ট্রাস্ট এবং কার্টেলের অংশীদার হয়েছে সেই সঙ্গে। গত যুদ্ধের সময় ভারতীয় একচেটে পুঁজিপতিদের হাতে কয়েকশো কোটি ব্রিটিশ মুদ্রা পাউন্ড-স্টার্লিং সঞ্চিত ছিল।

ভারত রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র

ফলে আমি যে কথা বলছিলাম, জাতীয় পুঁজির বিকাশের পথেই মনোপলির জন্ম হয়। তাই তারা যখন বলে যে, একচেটে পুঁজির বিরুদ্ধে তাদের লড়াই, তাহলে তো সেটা জাতীয় পুঁজির বিরুদ্ধেই লড়াই। যেমন স্ট্যালিন বলেছেন, জাতীয় বুর্জোয়ারাই এ যুগে যত প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছে তাতে তারা আর পুরনো যুগের মতো জাতীয় মুক্তি বা জাতীয় গৌরবের পতাকাটা উঁচু করে ধরে রাখছে না। তারা ক্রমে আরও অধিক মাত্রায় বহুজাতিক হয়ে উঠছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে তার অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে, আবার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সে বিপ্লববিরোধী, মুক্তিসংগ্রামের বিরোধী, প্রগতিবিরোধী, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরোধী, অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গিতে তারা সাম্রাজ্যবাদের সমার্থক হয়েছে। কারণ, সে নিজেই তো সাম্রাজ্যবাদী। এটা বুঝতে না পারার জন্য যখন সি পি আই, সি পি এম দেখে যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় একচেটে পুঁজি বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতার জন্য ভয়ানক দ্বন্দ্বে লিপ্ত, তখন তারা মনে করে যে, এই দ্বন্দ্বটা হচ্ছে ভারতীয় জাতীয় পুঁজির বিপ্লবাত্মক ভূমিকা এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার চরিত্র। আবার সেই ভারতীয় বুর্জোয়াদেরই যখন ভিয়েতনামের মুক্তিসংগ্রামের বিরুদ্ধে আমেরিকার প্রতি দুর্বলতা লক্ষ করে, সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দেখে,

গণতন্ত্রবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি দেখে, শান্তি ও স্বাধীনতার প্রতি কম আনুগত্য দেখে, আমলাতন্ত্র ও সমরবাদের প্রতি বেশি অনুরক্ত দেখে, তখন তারা সঙ্গে সঙ্গে বলে, এরা সাম্রাজ্যবাদের দালাল। অর্থাৎ, বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরোধিতা দেখলে তারা বলে, ভারতীয় বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল ভূমিকা রয়েছে, আবার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের, মুক্তিসংগ্রামের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনকারী দৃষ্টিভঙ্গি দেখে তারা বলে, এরা সাম্রাজ্যবাদের উপগ্রহ, তার সহযোগী। দুটোই ভুল। আসলে এটা হচ্ছে, নতুন গড়ে-ওঠা একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে বনেদি এবং শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের সম্পর্ক। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব এমন তীব্র আকার নিতে পারে যে, তাদের মধ্যে যুদ্ধ পর্যন্ত লেগে যেতে পারে। দুটো সাম্রাজ্যবাদী দেশের মধ্যে এইজন্যই যুদ্ধ হয়। দুটো দেশই সাম্রাজ্যবাদী, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ নিয়ে তারা পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। তারা অনুন্নত দেশগুলোর কাঁচামাল লুণ্ঠন করে, যেমন ভারতবর্ষও করছে। ভারতবর্ষ আফ্রিকাতে যে সহযোগী শিল্প তৈরী করছে, সেটা কি আফ্রিকার উন্নতির জন্য? নাকি সেখানকার সস্তা শ্রম ও কাঁচামাল লুঠ করার জন্য? সুদানে যে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা হল, তাতে সুদানে যে ভারতীয় জাতীয় পুঁজি খাটত, তা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এতকাল সেখানে ভারতীয় জাতীয় পুঁজি কী করছিল? সে কি সেখানে গান্ধী আশ্রমের কম্বল বিলি করছিল? ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা যদি ফিনান্সিয়াল অলিগার্কির হাতিয়ার হয়ে শোষণ না করবে, তাহলে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করছে কেন? ভারতবর্ষও যে এখানে বিদেশি ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ করতে বলে, তার কারণ বিদেশি ব্যাঙ্ক হল বিদেশের ফিনান্সিয়াল অলিগার্কির শোষণের হাতিয়ার। তারা ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মারফৎ ভারতবর্ষের শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করছে, সস্তা শ্রমশক্তি ও কাঁচামাল লুণ্ঠন করে তাদের বিদেশের আর্থিক গোষ্ঠীর জমিকে পাকা করছে। তারা কি জাতীয় স্বার্থ এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্বার্থে জাতীয়করণ করতে বলে? বর্মা যখন ভারতের ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ককে ন্যাশনালাইজ করতে বলল, কেন বর্মা তা চাইল? যদি বর্মার সস্তা শ্রমশক্তি এবং কাঁচামাল লুণ্ঠন করে এবং ওখানকার শিল্পে টাকা খাটিয়ে ভারতীয় পুঁজি তাকে লুঠ না করত, তাহলে ন্যাশনালাইজ করার প্রশ্নই উঠত না। নাহলে বর্মা ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করবে কেন? এমনকী ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হতে পারে এ ঝুঁকি নিয়েও, সম্পর্কের ক্ষেত্রে মনোমালিন্য হতে পারে জেনেও, তারা এটা করল। ভারতবর্ষের লগ্নিপুঁজি তো সেখানে গান্ধী আশ্রমের কম্বল বিলি করছিল না। সে সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র নিয়ে সেখানকার সস্তা শ্রম আর কাঁচামাল লুট

করছিল। ফলে ভারতীয় ব্যাঙ্কের কাজকর্মের প্রকৃতি সেখানে চরিত্রগত দিক থেকে ফিনান্সিয়াল অলিগার্কি, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকাই পালন করছিল।

একচেটিয়া পুঁজি জাতীয় পুঁজিরই পরিবর্তিত রূপ

এগুলোকে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যাবে, ভারতবর্ষ পিছিয়ে-পড়া দেশ নয়। ভারতবর্ষের পুঁজিপতিরা সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করে বসে আছে। একচেটিয়া কারবার আছে স্বীকার করলে, ব্যাঙ্কিংয়ের এই চরিত্র স্বীকার করলে, ফিনান্সিয়াল অলিগার্কির জন্ম অস্বীকার করা যায় না। সেদিন কাগজে দেখলাম, একটা হিসাব বলছে, বিদেশের বাজারে ভারতবর্ষের ৩০০ কোটি টাকার মতো লগ্নিপুঁজি খাটে । কী জন্য খাটে? বিদেশের শিল্পকে উন্নত করার জন্য কি? এরপরও কি ভারতবর্ষ অনুন্নত দেশ থেকে যায়? হ্যাঁ, ইউরোপের তুলনায় সে হয়তো অনুন্নত, কিন্তু সে কেবল পুঁজিবাদী দেশ নয়, ইতিমধ্যেই সে একচেটিয়া পুঁজিবাদের স্তরে প্রবেশ করেছে, ব্যবসা-বাণিজ্যে একচেটিয়া পুঁজির জন্ম দিয়ে ফিনান্সিয়াল অলিগার্কির জন্ম দিয়েছে, যাকে অর্থনীতির ভাষায় বলা হয় সাম্রাজ্যবাদ। এইরকম একটা অবস্থা ভারতীয় অর্থনীতির। সি পি আই, সি পি এম এটা মানে না। তারা বলে, তাদের সংগ্রাম একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে। অথচ তারা বলে, জাতীয় বুর্জোয়ারা তাদের বিপ্লবের পক্ষে থাকবে। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, তাহলে একচেটে পুঁজির মালিকরা জাতীয় বুর্জোয়া নয়। তাহলে একচেটিয়া পুঁজি এল কোথা থেকে? সেটা কি আকাশ থেকে পড়ল? জাতীয় পুঁজি ছাড়া কীভাবে একচেটে পুঁজির জন্ম হয়? এটা কোথাকার মার্কসবাদ? এসবই ওইসব পণ্ডিত লোকেরা বলছে। অদ্ভুত! তত্ত্ব নিয়ে তাঁদের প্রশ্ন করলে তাঁরা বলেন, ওসব ছোটবেলায় পড়েছিলেন, এখন ভুলে গিয়েছেন। এখন আর পড়াশুনার সময় কই, মালা পরারই সময় পান না। স্টান্ট দিয়ে দিয়ে, আর বক্তৃতা করে করে সময় পান না, পড়াশুনো করবেন কখন? তাদের নেতারা অনেক সময় ঠাট্টার সুরে এমন কথাও বলেন যে, পার্টির এত সব বক্তব্য — কে কোথায় কী বলল, পার্টি কী বিবৃতি দিল, অত দেখবার সময় নেই। আমরা বলি, হ্যাঁ, ত্রিসীমানায় তাদের মতো এত বড় দায়িত্ববান নেতা তো নেই! লেনিন যে এত বড় একটা বিপ্লব করে রাষ্ট্র চালিয়ে গেলেন, মাও সে-তুং যে রাষ্ট্র চালিয়েও চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব করে গেলেন, তাঁরা তো এত বড় দায়িত্ববান ছিলেন না! তাঁরাও বসে বসে বই পড়েছেন। পড়া ছিল তাদের একটা অবশ্য কাজ, কাজেরই প্রধান অঙ্গ। না পড়লে মূর্খরাই কি রাজনীতি চালাবে? তাহলে পড়তে হবে, জানতে হবে। মূর্খরা রাজনীতি চালাতে পারে না। আবার শুধু পড়লেই হয় না।

নাহলে এইসব পার্টিতে পণ্ডিত লোকের তো অভাব ছিল না। অথচ দলের মধ্যে একটি লোকও প্রশ্নটা তোলে না যে, একচেটে পুঁজিকে কী করে জাতীয় পুঁজির বাইরে ফেলা যায়? একচেটিয়া পুঁজি জাতীয় পুঁজিরই অঙ্গ, নয়ত একচেটে পুঁজি আসবে কোথা থেকে? তাদের সমস্যা হল, এই সত্যটা স্বীকার করে নিলে বিপ্লবের স্তর তো আর জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে থাকে না। জাতীয় একচেটিয়া পুঁজি স্বীকার করে নিলে রাষ্ট্রের চরিত্রটা জাতীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্রের চরিত্রে এসে যাবে এবং বিপ্লবের লক্ষ্য হয়ে যাবে, জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণিকে ক্ষমতা থেকে হটান।

ওদের আরও একটা ফাঁকি দেখুন। কৌশলগত স্লোগান-টোগান, চালাকির কথা যদি বাদও দিই, তাহলেও দেখব, সিপিআই, সিপিএম দুই দলই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রের চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছে, এটা হচ্ছে বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণির নেতৃত্বাধীন বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণির রাষ্ট্র। এই ধরনের অদ্ভুত কথার মানে কী? রাষ্ট্রের চরিত্র হয় ঔপনিবেশিক, বিদেশি শাসকরা সেখানে সরাসরি শাসন করে। না হয় আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক — মানে হল, জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি সেখানে ক্ষমতায় নেই, একটা আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা আছে, কিন্তু বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রীতিনীতি নেই। অর্থাৎ বিধানসভা, সংসদ, গণতান্ত্রিক অধিকার, মানে গণতান্ত্রিক আন্দোলন-ধর্মঘট ইত্যাদি জন্মলাভ করেনি। এটাই তো আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র। আর নাহয় জাতীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্র, নাহয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এই তো চারটি রাষ্ট্রের চরিত্র। তাদের যদি এখন জিজ্ঞেস করা যায় যে, তারা যে বলছে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রটা হচ্ছে বৃহৎ বুর্জোয়ার নেতৃত্বাধীন বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্র, তার দ্বারা রাষ্ট্রের গঠনের প্রকৃতিটা কী, সেটা নাহয় বলা হল, কিন্তু তার চরিত্রটা কী? সেটা কি আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক, না কি সেটা বুর্জোয়া জাতীয় রাষ্ট্র? সেটা তো পরিষ্কার করে বলতে হবে। না কি আবার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র মনে করে তারা এটাকে? যদি ভারতবর্ষকে তারা বুর্জোয়া জাতীয় রাষ্ট্র বলে, তাহলে তো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা তাদের বলতে হবে। তা তারা বলতে পারছে না, আবার আধা-সামন্ততান্ত্রিক বললেও মুস্কিল, তাহলে তো নকশালদের সাথে এক হয়ে যাবে। ঔপনিবেশিক তো বলতেই পারে না, কারণ এখন আর বিদেশি শাসন নেই। তাই তাদের মধ্যপন্থা! তারা বলছে, এটা বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণির নেতৃত্বাধীন পুঁজিপতি-জমিদার শ্রেণির রাষ্ট্র। আর এটা শুনে তাদের পার্টির কমরেডরাও খুব খুশি! এইভাবে দুই পার্টিই তাদের কর্মীদের ঠকাচ্ছে। মূলগতভাবে দুই পার্টির মধ্যে কোনও পার্থক্য না থাকলেও, তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে একটার পর একটা লড়াইয়ের মনোভাব সৃষ্টি

করছে। উদ্দেশ্য হল, যে স্তরটা মার্কসবাদ বোঝে না সেই সাধারণ স্তরের কর্মীদের উত্তেজিত রাখা, এবং যতদিন পারে প্রকৃত মার্কসবাদের তত্ত্বগত চর্চা থেকে তাদের দূরে রাখা যায়, তার চেষ্টা করা। কারণ কর্মীরা তত্ত্ব বুঝলে নেতাদের চালাকিটা পাঁচ মিনিটেই ধরে ফেলবে। বুঝে ফেলবে যে, শব্দগত পার্থক্য ছাড়া যাকে উঠতে বসতে সি পি এম শোধনবাদী বলে গালাগাল করছে, সেই সি পি আইয়ের সাথে সি পি এমের কোনও পার্থক্য নেই। সি পি এম লুকিয়ে-চুরিয়ে একই কাজ করছে, মূলগত বিশ্লেষণ তাদের দু' জনেরই এক।

জমির আয়তন দিয়ে কৃষিতে পুঁজিবাদ প্রমাণ হয় না

তারা ব্যাখ্যাটা এইরকম দিয়ে থাকে যে, ভারতবর্ষে পুঁজিবাদের বিকাশ এতদূর হয়নি, যার জন্য ভারতবর্ষ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে আছে বলা যেতে পারে। তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে এইরকম ব্যাখ্যা দেয়। কিন্তু রাজনৈতিক চরিত্রটা তারা বুঝতেই পারেনি, যার ফলে পুঁজিবাদের চরিত্র বুঝতে তারা ভুল করছে। রাষ্ট্রের গঠন ও তার চরিত্র তারা ধরতেই পারেনি। বিপ্লবের স্তর ঠিক হবে কী দিয়ে? অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা একটা যুক্তি খাড়া করেছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না পুঁজিবাদের বিকাশ একটা চূড়ান্ত বিন্দুতে পৌঁছায়, ততক্ষণ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয় না। তাহলে তারা জবাব দিক, রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয় কী করে? রাশিয়ায় পুঁজিবাদ কি সেই সময়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল? রাশিয়ায় নভেম্বর বিপ্লব, যাকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বলা হয়, সেটা ঘটবার সময় রাশিয়া পুঁজিবাদের বিকাশের দিক থেকে, মোট শিল্প উৎপাদনের দিক থেকে, শিল্পশ্রমিকের সংখ্যার দিক থেকে, সংগঠিত শিল্পকারখানার দিক থেকে এবং প্রযুক্তিগত উন্নতির দিক থেকে যে অবস্থায় ছিল, ভারতবর্ষের পুঁজিবাদ তার থেকে অন্তত বিশ-পঁচিশ গুণ এগিয়ে আছে। রাশিয়ায় গ্রামাঞ্চলে তখনও 'সামন্তী' প্রথা ছিল। সমাজব্যবস্থা হিসাবে সেখানে 'সামন্ত প্রভুরা'ই তখন গ্রামীণ শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করত। তা সত্ত্বেও লেনিন কিন্তু বুঝতে ভুল করেননি যে, সেখানে কৃষিতে পুঁজিবাদ কত দ্রুততার সঙ্গে প্রবেশ করছে। কৃষিতে পুঁজিবাদ ঢুকেছে কি না, তা জমির আয়তন ছোট কী বড় — এর দ্বারা প্রমাণ হয় না। মূলত প্রমাণ হয় কৃষিপণ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা। কৃষিপণ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের ধরনই নির্ধারণ করবে সেখানকার অর্থনীতি সামন্ততান্ত্রিক, নাকি পুঁজিবাদী অথবা সমাজতান্ত্রিক। সেইজন্য দেখতে হবে, পণ্যের চরিত্র কী, সেটা সামন্ত্রতান্ত্রিক অর্থনীতির পণ্য কি না, স্থানীয় বাজারে অর্থ ব্যবহার করে যে বিনিময় প্রথা চলে, সেই ধরনের বাজারের পণ্য কি না। অথবা

এটা এমন একটা পণ্য, যেখানে জমিতে পুঁজি বিনিয়োগ করে সামাজিক উৎপাদন রূপে কৃষির উৎপাদন হয় এবং সেটা বিক্রির জন্য জাতীয় বাজারে যায় এবং বুর্জোয়া জাতীয় বাজার ও স্টক এক্সচেঞ্জের দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত হয়। এরকম হলে তা পুঁজিবাদী জাতীয় বাজারের পণ্য। আর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে যেখানে জমি সহ কৃষিব্যবস্থার ওপরে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং সেই নিয়ন্ত্রণের অধীনে যতটুকু ব্যক্তিগত খামার থাকে, সেই ব্যক্তি খামারের পণ্যও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণাধীন, সমাজতান্ত্রিক বাজারের অঙ্গ। তাহলে, কৃষিপণ্য পুঁজিবাদী জাতীয় বাজারের পণ্যে পরিণত হয়েছে কি না, এটাই হল কৃষিতে পুঁজিবাদ ঢুকেছে কি না তা বিচারের মূল বিষয়। এর উপরে নির্ভর করছে ভারতের কৃষিব্যবস্থার চরিত্র নির্ধারণ করা।

ইউরোপে যখন বুর্জোয়া বিপ্লবের শুরুতে সামন্ততন্ত্র ভেঙে পুঁজিবাদ এসেছিল, তখন কৃষিতে যন্ত্রপ্রযুক্তি বুর্জোয়ারাই নিয়ে এসেছিল। তখন শিল্প উৎপাদনের অবিরাম উন্নয়ন এবং বৃহদায়তন উৎপাদনের জন্য ক্রমাগত গ্রাম থেকে লোককে উদ্বৃত্ত করার দরকার ছিল। এইজন্য তখন কৃষিতেও দ্রুতগতিসম্পন্ন যন্ত্র প্রচলন করবার দরকার ছিল। আর এযুগে কল-কারখানা অতি উৎপাদনের পুঁজিবাদী সংকটে ভুগছে। বেকার সমস্যা বাড়ছে। তাই জাপান একটি বৃহৎ পুঁজিবাদী দেশ, উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর মধ্যে একটা দেশ — সেও ছোট ছোট জোত করে জাপানি প্রথায় চাষ করে। উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর কৃষির দিকে সে যাচ্ছে না। তাহলে কী দাঁড়ায়? ছোট ছোট কৃষি জোত থাকলে এবং যন্ত্র দিয়ে চাষবাস না করা হলেই কি সামন্ততন্ত্র আছে বলতে হবে? সামন্ততন্ত্র আছে কি না, সে প্রশ্ন যুক্ত সামন্তী উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে — অর্থাৎ, উৎপাদনে যে সম্পর্ক রয়েছে, আর উৎপাদনের যে চরিত্র বৈশিষ্ট্য, তা সামন্ততান্ত্রিক কি না।

কৃষিতে পুঁজিবাদ — তিনটি লক্ষণ

তাই কৃষিতে পুঁজিবাদ এসেছে কি না তা বুঝতে লেনিন তিনটি লক্ষণ (symptom) দেখিয়েছেন। একটা হচ্ছে, কৃষিশ্রমিকের সংখ্যাবৃদ্ধি। কৃষিশ্রমিকের এই সংখ্যাবৃদ্ধি পুঁজিবাদের একটা নির্দেশক চিহ্ন। কৃষিশ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবণতার মানে হল, পুঁজিবাদ নিশ্চিতভাবে কৃষিতে প্রবেশ করেছে। তা না হলে এটা হয় না। আর কী? যে চেহারাতেই হোক না কেন, অল্প কয়েকজনের হাতে জমির কেন্দ্রীভবন। অর্থাৎ, বেনাম, স্বনাম, কো-অপারেটিভ, হেন-তেন, যে ধরনেই হোক বেশিরভাগ লোকের হাত থেকে

জমি চলে গিয়ে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে জমি জমা হচ্ছে। এটি দু'টি কারণে ঘটছে। এক, ঋণের অর্থনৈতিক প্রভাব। দুই, পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও জাতীয় বাজারের শিল্পপণ্যের সাথে কৃষিজাত পণ্যের সমতা বা লেভেল রাখতে না পারা। ফলে প্রয়োজনের তুলনায় কৃষকের হাতে জমি কম থাকবার জন্য এই যে দুটোর শোষণ, অর্থাৎ, অর্থ ঋণ নেওয়া এবং প্রকৃত কৃষকের কৃষিপণ্যের উপযুক্ত দাম না পাওয়া, এ দুটোর প্রভাবে কৃষকের হাত থেকে জমি চলে যাচ্ছে। এর সাথে আরেকটা জিনিস আসছে যে, জমি কেনবার অধিকার ব্যক্তি চাষির বেড়েছে, যেটা আগের যুগে ছিল না। কৃষিতে পুঁজিবাদ না এলে এটা ঘটে না। আর এর ফলে জমির সামগ্রিক চরিত্রটাই পাল্টে যাচ্ছে। অতীতে জমি ছিল জীবনধারণের মাধ্যম, সাধারণত ভোগের জন্য উৎপাদন হত, আর একটা উদ্বৃত্ত যা তৈরি হত তা অন্যদের সাথে অর্থের মাধ্যমে বিনিময় হত। যেটুকু বিনিময় হত, সেটুকুও অন্যান্য ভোগের সামগ্রী সংগ্রহ করার জন্য হত। অর্থাৎ সবটাই নিজের ভোগের জন্য হত। ফলে পুঁজি গঠনের পরিমাণ ছিল সেক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্ষুদ্র। আর এখন হচ্ছে কী? জমির সেই চরিত্রটাই নষ্ট হয়ে গেল। মুষ্টিমেয় লোকের হাতে জমি সংহত হওয়ার ফলে যারা জমির মালিক, তারা ভোগের জন্য চাষবাস করে না। চাষবাসে যে টাকাটা বিনিয়োগ করে, তার তিনগুণ, চারগুণ টাকা তুলে নেওয়ার জন্য তা করে। মোট যা ধান চাষ করে তার থেকে খাওয়ার জন্য অল্প কিছু রেখে বাকিটা বিক্রি করে। অনেকে আবার যে ধান চাষ করে তা খায়ই না, সবটাই বিক্রি করে দিয়ে বাজার থেকে অন্য চাল কিনে খায়। ফলে জমির চরিত্র সম্পূর্ণভাবে পাল্টে গিয়েছে। জমি হয়ে যাচ্ছে বা ইতিমধ্যেই হয়ে পড়েছে জাতীয় পুঁজিবাদী বাজারের জন্য উৎপাদনের উপকরণ। ফলে ভারতবর্ষে যে জাতীয় পুঁজি পুঞ্জিভূত হচ্ছে, তার বেশিরভাগটাই হচ্ছে এই পদ্ধতিতে। সামন্ততন্ত্রে পুঁজি গঠন ছিল না, এখন পুঁজিবাদে তা হচ্ছে। সামন্ততন্ত্রে টাকা ছিল ব্যুরোক্রেটিক, অলস। কারণ সামন্তপ্রভুরা তাদের আমিরির জন্য সেটা নিয়ে বসে থাকত, গ্রামীণ শিল্পক্ষেত্রে তা লাগাতে পারত না। কিছু কিছু সামন্তপ্রভু ছোট ছোট কারখানা এবং নানান ব্যবসায় নামত, রামগড়ের রাজা এইরকম একটা উদাহরণ। তারাও পরিবর্তিত হচ্ছে। সমস্ত প্রাচীন সামন্তপ্রভুরা কালক্রমে নিজেদের শিল্পপতি বা ব্যবসাদারে, অর্থাৎ পুঁজিপতি শ্রেণিতে রূপান্তরিত করেছে। এই পদ্ধতিতে তারা নিজেরা গ্রামীণ বুর্জোয়া শ্রেণিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

তৃতীয় বিষয় হচ্ছে, কৃষি উৎপাদনের চরিত্র। অর্থাৎ সেটা সামন্তী অর্থনীতির পণ্য কি না। এর মানে হল, তা স্থানীয় বাজার অর্থনীতির পণ্য, জাতীয় বাজারের

পণ্য নয়। ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে স্থানীয়, স্বনির্ভর কৃষিপণ্যের বাজার অর্থনীতির অস্তিত্ব নেই। গ্রামের দুধ গ্রামে থাকে না, গ্রামের শাক-সবজি, ডিমটি গ্রামে পাওয়া যায় না, শহরে চলে আসে। যাকে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি বলে ভাবি, ভারতবর্ষে সুদূর অতীতকালে তা ছিল। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি হচ্ছে, গ্রামের মধ্যে কুমোর আছে, কামার আছে, তাঁতি আছে, কলু আছে, জোলা আছে, সব একত্রে থাকে এবং তারাই পরস্পরের মধ্যে তাদের জিনিসপত্র অর্থের বিনিময়ে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে। সেখান থেকে যা অর্থ পায় তা দিয়ে স্থানীয় বাজার থেকে নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনে। গ্রামীণ জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসের জোগানের জন্য শহরের উপর মূলত নির্ভর করে না। স্থানীয় কৃষি অর্থনীতিটা স্বয়ংসম্পূর্ণ। স্থানীয় বাজার তাই স্বয়ংসম্পূর্ণ।

চীনের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তাৎপর্য

চীনের ক্ষেত্রে যখন জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব বলা হয়েছে, তখন বলা হয়েছে, চীন ছিল একটি আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র। একটা কেন্দ্রীভূত আধুনিক রাষ্ট্র বা জাতীয় রাষ্ট্র সেখানে ছিল না। জাতীয় রাষ্ট্র বা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়? লেনিন মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাধীন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের পার্থক্য দেখাতে গিয়ে বলেছেন, স্বাধীন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হল, প্রথমত, তার কেন্দ্রীভূত আধুনিক চরিত্র। দ্বিতীয়ত, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সে জাতীয় পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করে। সেটাই হল পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। এবারে দেখুন, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রটা জাতীয় রাষ্ট্র কি না। চীন বিপ্লবের সময় চীনের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে মাও সে-তুং বলেছেন, চীন একটা আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র, পুঁজিবাদী জাতীয় রাষ্ট্রের পত্তন সেখানে হয়নি। তাই কোনও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, যেমন বিধান সভা, সংসদ ইত্যাদি সেখানে কিছুই ছিল না। চীন রাষ্ট্র হল মধ্যযুগীয় রাষ্ট্র। ভৌগোলিক প্রশাসনের ক্ষেত্রে সে স্থানীয় জমিদারদের উপর নির্ভর করে। তার কোনও কেন্দ্রীয় প্রশাসন, সেনাবাহিনী নেই। তার আছে আলাদা আলাদা স্থানীয় জমিদারদের সেনাবাহিনী। কোনও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে আলাদা আলাদা স্থানীয় সেনাবাহিনী থাকে নাকি? কোনও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পৃথক শাসকদের পৃথক সেনাবাহিনী থাকে না। তাই ওটা হল মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। সেখানে উপরে একজন সম্রাট থাকে, তাকে সবাই খাজনা দেয়, আর যার যার জায়গায় প্রত্যেকের নিজস্ব সেনাবাহিনী থাকে। শাসনতন্ত্রটন্ত্র সব কিছু তারা নিজেরা দেখে। সেখানে বিচারব্যবস্থা নেই, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নেই, আইনের শাসন বলতে যা বোঝায়, তাও নেই। সীমাবদ্ধতা যাই থাকুক, অন্তত বুর্জোয়া

অর্থে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং তার শাসন বলতে যা বোঝায়, তার কোনওটাই সেখানে অবস্থান করে না। স্থানীয় শাসকরা, জমিদাররা, নিজেরাই তাদের নিজস্ব সেনাবাহিনী, পাইক-বরকন্দাজদের পালন করে। তাই আধুনিক কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র বলতে যা বোঝায়, চীনে তা ছিল না। সমস্ত দেশটাকে টুকরো টুকরো করে জমিদাররা, সামন্তী প্রভুরা নিজস্ব সেনাবাহিনী দিয়ে শাসন করত। কখনও কখনও জমিদাররা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করেছে, আর বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদীরা এই সুযোগে তাদের পরাস্ত করে তাদের পুতুল বানিয়ে ফেলেছে এবং তারা পিছন থেকে এদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ লাগিয়ে দিয়ে চীনকে বিভিন্ন এলাকায় ভাগ করে শাসন করার নীতি প্রয়োগ করেছে। চীনে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের প্রধান হিসাবে কেউ ছিল না। চীন ছিল প্রাক-পুঁজিবাদী মধ্যযুগীয় রাষ্ট্র। আর ভারতবর্ষ, আমাদের দেশ? আমাদের দেশ হল একটি আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্র, যেটি ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজি বা ভারতের জাতীয়. পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করছে। তারা কেন সাম্রাজ্যবাদের সাথে সহযোগিতা করছে , তা এ যুগের পুঁজিবাদের আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্য এবং দ্বন্দ্ব পর্যালোচনার ব্যাপার। কিন্তু এটা যে জাতীয় রাষ্ট্র, সেকথা অস্বীকার করা যায় না।

চীনের সাথে ভারতের পরিস্থিতির পার্থক্য

রাষ্ট্রের বিকাশে মধ্যযুগীয় না জাতীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেটা বোঝার জ্ঞানটুকু থাকলে এই তিনটি পার্টি বুঝতে পারত যে, চীন একটি আধা-সামন্ততান্ত্রিক, মধ্যযুগীয় ধরনের বিকেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র ছিল। যা ভারতের ক্ষেত্রে খাটে না। ভারতবর্ষের আধুনিক কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রযন্ত্রের অবস্থানের কারণ হচ্ছে, ব্রিটিশ যুগ থেকে ভারতীয় জাতীয় পুঁজির সূচনা, এই ছকে তার গঠন এবং এইটে হচ্ছে ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার একটা প্রধান ভিত্তি। রাজনৈতিক ক্ষমতা তার একটা মৌলিক প্রশ্ন, যেখানে চীনের সঙ্গে আমাদের প্রধান পার্থক্য।

চীনকে বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করে নিয়ে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীরা শাসন করেছে। ভারতবর্ষে কি দক্ষিণটা এই সাম্রাজ্যবাদীর অধীন, উত্তরটা অমুক সাম্রাজ্যবাদীর অধীন, পশ্চিমটা আরেকটা সাম্রাজ্যবাদীর অধীন, পূর্বটা অমুক সাম্রাজ্যবাদীর অধীন — এমন নাকি? আবার চীনে যেমন একই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অধীনে জমিদাররা পরস্পর লড়ালড়ি করেছে, ভারতবর্ষেও কি তাই? নাকি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের স্বার্থে রাষ্ট্রশক্তির যে সংহতি দেখা যায়, তা পুঁজিপতিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও যথেষ্ট মজবুত। এখানে একটি কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক যন্ত্র আছে, একটি কেন্দ্রীয়, উন্নত কলাকৌশল সমন্বিত ভাড়াটে

সেনাবাহিনী আছে। এই হচ্ছে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রের ব্যাপার। তার উপর সংগঠনের দিক দিয়ে দেখতে গেলে চীনের একটা সুবিধা ছিল। ইউরোপের বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির তুলনায় চীনের পার্টির শক্তি কম হতে পারে, কিন্তু ইউরোপের দেশগুলির রাষ্ট্রশক্তি যতটা সংহত, কেন্দ্রীভূত এবং তাদের আঘাত করবার শক্তি যত আধুনিক, তুলনামূলক ভাবে চীনের পার্টির সংগঠনের তুলনায় চীনের রাষ্ট্রশক্তির আঘাত বা প্রত্যাঘাত করবার শক্তি কম। কারণ, এটা অনেক বেশি বিকেন্দ্রীভূত এবং মধ্যযুগীয় চরিত্রের। চীন দেশটাকে টুকরো টুকরো করে সাম্রাজ্যবাদীরা শাসন করেছে। তার উপর সেখানে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহ করেছে। ফলে তারা একটা সংহত ও কেন্দ্রীভূত বিরোধীপক্ষ হিসাবে দাঁড়াতে পারেনি। সেখানে ওই ধরনের আধুনিক ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীর অস্তিত্ব ছিল না। ফলে চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনা হয় না। চীনে বিপ্লবের শক্তি কম হলেও বিপ্লব শুরু করা যায় না, তা নয় — এটাই ছিল মাও সে- তুং- এর যুক্তি। তাই বেশি কথা না বলে মাও সে- তুং বিপ্লবটা শুরু করে দিয়েছিলেন। ইউরোপের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির থেকে তার পার্টির শক্তি কম ছিল। তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করে বলেছেন, ইউরোপের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি থেকে তার পার্টির শক্তি কম থাকা সত্ত্বেও অনেক দেশের পার্টির থেকে আগে তিনি শুরু করতে পারলেন কেন? পারলেন চীনের বিচ্ছিন্নতার কারণে, যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবের কারণে। একটা এলাকার সাথে আরেকটা এলাকার যোগাযোগ ছিল না, সেনাবাহিনী তাই এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যাতায়াত করতে পারত না। চীনে কোনও আধুনিক প্রশাসন ছিল না। প্রত্যন্ত এলাকায় সমস্ত গ্রামগুলি পরজীবী জমিদারদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। তাদের ছিল কিছু পাইক বরকন্দাজ, যাদের দিয়ে তারা লড়তে না পেরে শহরে গিয়ে আশ্রয় নিত। আলেকজান্ডারের আমলের মতো তারা ঘোড়ার পিঠে করে খবর পাঠাত, সেনাবাহিনী পাঠাবার মতো ক্ষমতা থাকলে পাঠাত, না হলে সার্কুলার দিত যে, তারা যেন নিজেদের সেনাবাহিনী গঠন করে। এই ছিল চীনের রাষ্ট্রের চরিত্র এবং তার প্রশাসন। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রটার সঙ্গে এবার মিলিয়ে দেখুন। রাষ্ট্রের চরিত্রই তো বিপ্লবের নির্ধারক বিষয়। একটি বিপ্লবের মূল প্রশ্ন হল, রাষ্ট্রশক্তির চরিত্র, কোন ধরনের রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করা হবে তার চরিত্র।

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, মাও সে-তুং শুধু গ্রামাঞ্চল দুর্বল, এইজন্যই গেরিলা যুদ্ধের কৌশল, অর্থাৎ গ্রামকে মুক্ত করা এবং গ্রাম দিয়ে শহরকে ঘেরাও করার নীতি গ্রহণ করেননি। এরা চীন বিপ্লবকে ভাল করে পর্যালোচনাই করেনি। এরা মাওয়ের পথ, মাওয়ের পথ বলে মন্ত্র জপেছে, কিন্তু মাও কোন প্রসঙ্গে, কোন

পরিপ্রেক্ষিতে, কী কী বিবেচনা করে এবং সমগ্র জিনিসটাকে কীভাবে পর্যবেক্ষণ করে তবে একটা রণকৌশল নিয়েছিলেন, তার ভেতরে না গিয়ে এক একটা বিষয়কে আলাদা করে দেখেছে। যেমন মাও সে-তুং দেখিয়েছেন, চীনে রয়েছে স্থানীয় কৃষি অর্থনীতি, অর্থাৎ সেখানে একটি জাতীয় অর্থনীতির জন্ম হয়নি, জাতীয় বাজারের জন্ম হয়নি। কী করে তা হবে? যোগাযোগ ব্যবস্থা, রাস্তাঘাটের উন্নতি না ঘটলে জাতীয় অর্থনীতি এবং জাতীয় বাজারের জন্ম কী করে হবে? তার জন্য প্রয়োজন, প্রথমত একটি জাতীয় ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যবস্থা। বাণিজ্যব্যবস্থা বিকাশ লাভ করে আগে, তারপর একটা জাতীয় অর্থনীতি পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হয়। চীন সেই স্তরে ছিল না। চীনের অর্থনীতি ছিল স্থানীয় কৃষি অর্থনীতির স্তরে। পাশাপাশি, ভারতবর্ষের পরিস্থিতি কী? ভারতবর্ষে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি আছে নাকি? নাকি এখানে গ্রামের একটা ছোট মুদির দোকানের মালপত্রের সরবরাহও শহরের ব্যবসা-বাণিজ্যে, জাতীয় ক্ষেত্রের ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা রয়েছে তাদের জোগানের উপর নির্ভর করে? তাই একদিকে কেন্দ্রীভূত প্রশাসনের অনুপস্থিতি এবং কোনও কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনী না থাকা, আবার দেশটা বিভিন্ন প্রশাসকের অধীনে টুকরো টুকরো হয়ে আছে বলে প্রশাসনের দুর্বলতা, অপরদিকে স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি — এই ছিল চীনের অবস্থা। গোড়ায় বিপ্লবের কাজ যখন শুরু হয় তখন রাষ্ট্রের সংগঠিত মিলিটারি শক্তির চেয়ে বিপ্লবের সেনাবাহিনী বা গেরিলা শক্তি কমই থাকে। রাজনৈতিক শক্তির দিকটা, জনতার সমর্থনের দিকটা ক্রমে বাড়তে বাড়তে বিপ্লবীদের দিকে আসতে থাকে এবং শেষপর্যন্ত বিপ্লব বিজয়লাভ করে। মাও বলেছেন, এই যে গ্রামাঞ্চলকে প্রথমে মুক্ত করার জন্য তারা যে লড়াইগুলো করবে, সেই লড়াইগুলো টিকে থাকবে কীভাবে? টিকে যদি না থাকে তো তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই একই সাথে চাই সংহতিসাধন এবং সম্প্রসারণ। শুধু একপেশে সম্প্রসারণ নয়, ছড়িয়ে ছিটিয়ে হামলা করে যাওয়া নয়। নীতিটা হবে গ্রাম দখল কর, প্রশাসন তৈরি কর, স্থানীয় মানুষের মন জয় কর, তাদের জমিদারদের অত্যাচার থেকে রক্ষা কর, জমি বণ্টন কর। এইভাবে বিপ্লবের পক্ষে জনগণের মধ্যে গড়ে উঠবে বুনিয়াদ। জনগণ বিপ্লবীদের খাদ্য দেবে, রসদ দেবে, আশ্রয় দেবে, সমস্ত বস্তুগত সমর্থন দেবে। তার ভিত্তিতে বিপ্লবীরা সম্প্রসারণ করবে। মাও বলেছেন, ধরুন কোনও একটা জায়গা বিপ্লবীরা দখল করল, সেই খবর নানকিং-এ পৌঁছানোর সাথে সাথে জমিদাররা সব মিলে সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়তায় চারদিক থেকে বিপ্লবীদের ঘিরে ফেলল। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া যায় যে, বিপ্লবীদের শক্তি এমন যে, জমিদারদের সেনাবাহিনী ভেতরে ঢুকতে পারছে না, তাদের বিপ্লবীরা রুখে

দিচ্ছে, তাহলেও প্রশ্ন থাকে, বিপ্লবীদের পক্ষে অর্থনৈতিক জীবন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেঁচে থাকা যাবে কী করে? রসদ কোথা থেকে পাওয়া যাবে? এর উত্তর হল, চীনা অর্থনীতি যেহেতু ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ স্থানীয় অর্থনীতি, যেখানে দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিসগুলো মূলত শহরের জোগানের উপর নির্ভরশীল নয়, সেগুলো গ্রামেই উৎপাদিত হয়, সেই কারণে সেখানে 'মুক্ত এলাকার' পক্ষে শত্রু পরিবেষ্টিত হয়েও টিকে থাকা সম্ভব ছিল। অন্যদিকে ভারতবর্ষে, বুর্জোয়ারা মিলিটারি দিয়ে যদি আমাদের ঘিরে ফেলে, তাহলে কী ঘটবে? তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নিই যে, সেই মিলিটারি শক্তিকেও আমরা প্রতিরোধ করতে পারছি, তারপরেও তো প্রশ্ন থাকবে যে, ভারতীয় জাতীয় বাজার থেকে আমাদের রসদের জোগান যদি বন্ধ হয়ে যায়, তবে খাব কী? কী করে বাঁচব? মিলিটারিকে আটকাতে পারলেও অর্থনৈতিকভাবে বিপ্লব বাঁচতে পারবে না — বাঁচিয়ে রাখতে পারব না। তাই চীনের নীতি এখানে প্রয়োগ করাই যায় না। অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে যদি বিপ্লবীরা ঘাঁটিগুলো সৃষ্টি করতে সমর্থও হয়, তাকে টিকিয়ে রাখতে হলে শহরাঞ্চলের মজুররা যদি অভ্যুত্থানের দ্বারা পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনীকে একই সাথে ব্যস্ত রাখতে না পারে, তাহলে গ্রামাঞ্চলের কৃষক বিদ্রোহ এবং ঘাঁটিগুলিকে রক্ষা করতে পারা যাবে না। আর একবার যদি আমাদের চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে, তাহলে সেনাবাহিনীর হাতে যদি নাও হয়, অর্থনৈতিক কারণেই আমরা মারা যাব। তাই দুটো এক নয়, দুটো দেশ এক নয়। চীনের সঙ্গে আমাদের বহুদিকে পার্থক্য আছে।

ভারতবর্ষের জাতীয় বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় সেই জাতীয় বুর্জোয়াদের একটা অংশ ছিল টাটা-বিড়লার মতো পুঁজিপতিরা, যারা আজকে একচেটিয়া পুঁজিপতি হয়েছে। ফলে এখানে যারা একচেটিয়া পুঁজিবাদের জন্ম দিয়েছে, তারাই জাতীয় বুর্জোয়া। আর মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া যাদের বলে, তারা কারা? মুৎসুদ্দি পুঁজি হল, বণিকি চরিত্রের পুঁজি, যারা বিদেশ থেকে পণ্য এনে জাতীয় বাজারে বিক্রি করে এবং দেশের পুঁজি গঠনে সাহায্য করে। কিন্তু আমাদের দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা টাকা খাটাচ্ছে, তারা আমেদাবাদে তৈরি মাল নিয়ে ব্যবসা করছে, টাটার তৈরি মাল নিয়ে ব্যবসা করছে, দেশে উৎপন্ন পাট নিয়ে, টি-গার্ডেনে উৎপন্ন চা নিয়ে ব্যবসা করছে। এই দেশের জাতীয় পুঁজির শিল্পজাত দ্রব্য নিয়ে যেসব বণিকরা ব্যবসা করছে, তারা কি মুৎসুদ্দি পুঁজি? এখানে আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে, কাকে আমরা আমলাতান্ত্রিক পুঁজি বা অলস

পুঁজি বলব? যে পুঁজিটা সঙ্কটের জন্য অলস, তাকেই আমলাতান্ত্রিক পুঁজি বলে। অর্থাৎ যেখানে সঙ্কট আছে, সমাধান নেই, যেখানে পুঁজি শিল্পে বিনিয়োগ করতে পারে না, যে পুঁজিটা বিনিয়োগ করতে চায় না, শুধু ভোগের জন্য, ফূর্তি করার জন্য মানুষ চায়, সেটার নাম আমলাতান্ত্রিক পুঁজি।

চীনে শিল্পপুঁজি এত ভ্রূণাবস্থায় ছিল যে, মাও সে-তুং একটা বইয়ের মধ্যে তা উল্লেখ করেছেন। 'চেন পো তা' র লেখা 'কমিউনিস্ট পার্টির ত্রিশ বছর' বইতেও দেখবেন, মাও সে-তুং রণকৌশলের সংক্ষিপ্ত খসড়ায় বলেছেন, নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। তাতে দেখিয়েছেন, চীনের মূল শত্রু কারা, আর জাতীয় বুর্জোয়া কারা। তিনি চীনে জাতীয় বুর্জোয়া বলতে বুঝিয়েছেন, শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে। আর ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রাম আর দুটো যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এখানকার একচেটিয়া পুঁজি লগ্নিপুঁজির জন্ম দিয়ে সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হয়েছে — সাম্রাজ্যবাদী হয়েছে। আমেরিকার আব্রাহাম লিঙ্কনের আমলের জাতীয় পুঁজিপতিরা যেমন করে আজকের সাম্রাজ্যবাদীতে রূপান্তরিত হয়েছে, যেমন করে শিল্পবিপ্লবের যুগের ইংল্যান্ডের জাতীয় পুঁজিপতিরা পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদীতে রূপান্তরিত হয়েছে, এই ভারতবর্ষেও জাতীয় পুঁজিপতিরা মনোপলি বা একচেটে পুঁজি শুধু নয়, লগ্নিপুঁজির জন্ম দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীতে রূপান্তরিত হয়েছে। ফলে তিনটি পার্টি এই ব্যাপারে যে সমস্ত কথা বলে, সেগুলো বিভ্রান্তিকর, ভ্রান্ত।

এস ইউ সি আই'র বড় হওয়ার পদ্ধতি অন্যরকম

এই পরিস্থিতিতে আদর্শগত সংগ্রামের হাতিয়ারকে ব্যবহার করে আলোচনার মধ্য দিয়ে খুব গভীরভাবে নাড়া দিয়ে দেশের প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে একত্রিত করতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে, বিপ্লবই আসলে বিকল্প। কিন্তু বিপ্লবের জন্য বিপ্লবী পার্টি চাই। আর কার কত শক্তি, তাই দিয়ে বিপ্লবী পার্টি বিচার করতে যাবেন না। কারণ, অবিপ্লবী পার্টিরও শক্তিবৃদ্ধি হয়। নাহলে মুসলিম লীগের শক্তিবৃদ্ধি হত না, জনসংঘের শক্তিবৃদ্ধি হত না, সভ্যতার চরম শত্রু হয়েও হিটলারের পার্টি গোটা জার্মানিকে তার পেছনে জড়ো করতে পারত না। শুধু মালিকদের সমর্থনে এটা হয় না। কারণ দেশে মালিকরা আর ক'জন? জনসাধারণ সমর্থন না করলে তাদের শক্তি টেকে কী করে, বাড়ে কী করে? জনগণ বহু কারণেই তাদের সমর্থন করতে পারে ও করে, যদি না সত্যিকারের বিপ্লবী চেতনা তাদের মধ্যে দেওয়া যায়। তাই আপনাদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বুঝতে হবে, বিপ্লবী পার্টি বুঝতে হবে, বুঝতে হবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হল একমাত্র

হাতিয়ার। এই বিজ্ঞানটা আয়ত্ত করতে পারলে, তার প্রয়োগ কৌশলটা আয়ত্ত করতে পারলে আপনারা জনগণকে এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করে কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক বোঝাতে পারবেন। আপনারা বোঝাতে পারবেন যে, মার্কসবাদের নামে বাকি পার্টিগুলো শুধুমাত্র শব্দগত পার্থক্য ছাড়া একই কথা বলে কীভাবে জনগণকে ঠকাচ্ছে। এ জিনিস বুঝিয়ে এইসব দলের প্রভাব থেকে জনগণকে তখনই আপনারা মুক্ত করতে পারবেন, যখন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ যথার্থভাবে আপনারা আয়ত্ত করতে পারবেন। তাছাড়া আমাদের দল সঠিক কি না, সঠিক হলে কীভাবে সঠিক এবং বিপ্লবকে আমরা কীভাবে দেখছি এবং কীভাবে করতে হবে, সেটা বুঝতে পারবেন এবং সেইভাবে বিপ্লবের প্রস্তুতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন।

বিপ্লবের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আরেকটা বড় কথা হল, যুক্ত আন্দোলনকে, যুক্তফ্রন্টকে রক্ষা করতে হবে। সমস্ত পার্টি যখন লড়ে, তখন তারা নিজের নিজের পার্টির প্রতি আনুগত্য নিয়েই লড়ে, অপর পার্টি সম্পর্কে একটা বিরোধিতার ঝোঁক সৃষ্টি করেই লড়ে। বিশেষ করে এস ইউ সি আই-এর আদর্শ যাতে সি পি এমের কর্মীদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে না পারে, সে ব্যাপারে তাদের নেতারা সতর্ক থাকে। কারণ তারা জানে, এস ইউ সি আইয়ের বক্তব্যের সামনে তারা পার্টিকে ধরে রাখতে পারবে না। তাদের কর্মীদের মধ্যে প্রশ্ন উঠবে। যেমন ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের উপর আমাদের দলের বক্তব্য নিয়ে তাদের দলে এ জিনিস হয়েছে। তাদের দলের সব বড় বড় তাত্ত্বিক নেতারা, এত অন্ধতার মধ্যেও পার্টির মধ্যে এ নিয়ে প্রশ্ন তোলা বন্ধ করতে পারেনি। ফলে এটা সত্য যে, এস ইউ সি আইয়ের রাজনৈতিক বক্তব্য শোনবার মন যাতে তাদের কর্মীদের মরে যায়, তার জন্য তাদের দলের নেতারা এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রেখেছে। যত তাদের দলের কর্মীরা আমাদের সাথে ঘনিষ্ঠ হবে, আমাদের মতামত শুনবে, আলোচনা করবে, বিশ্লেষণ করবে, তত তাদের কর্মীদের চোখ খুলে যাবে। তারা অন্তত বিচার করতে শিখবে যে, সি পি আই যদি শোধনবাদী হয়, তবে সি পি এম আরও খারাপ জাতের শোধনবাদী এবং এস ইউ সি আই যা বলছে, তার প্রভাব তাদের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে পড়বে। স্বভাবতই সি পি এমের কর্মীদের প্রথমত আমাদের বলতে হবে যে, হ্যাঁ, তাদের বিচারে আমরা তাদের শত্রু, কিন্তু শত্রুতে শত্রুতে তো পার্থক্য থাকে। টাটা-বিড়লা বা মালিকগোষ্ঠী যে জাতের শত্রু, এস ইউ সি আই কি সেই রকমের শত্রু? এস ইউ সি আইকে কি একইভাবে দেখা চলে? হ্যাঁ, আদর্শের ক্ষেত্রে তারা আমাদের শত্রু মনে করতে পারে। কারণ,

তাদের মতে, অন্যরা তাদের সম্পর্কে আর কী বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে, তার চেয়ে এস ইউ সি আই আরও বেশি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। ঠিক আছে। তাহলে আমরা আদর্শের কথা যেভাবে বলি, যা বলি, সি পি এম যদি মনে করে, তা মিথ্যাচার, তাহলে সেইটা ব্যাখ্যা করে দেখিয়ে দিক। তাতে অন্তত এস ইউ সি আই'র মধ্যে দুটো-চারটে ভাল লোক যদি থাকে তাদের তো উপকার হবে, তারা সি পি এম পার্টিতে চলে যাবে! তাহলে আদর্শগত সংগ্রামটা তারাও করুক। আমাদের দলের বিরুদ্ধে তাদের যা বক্তব্য, বা আমরা যা বলছি, তার ত্রুটি কোথায়, সেগুলো মার্কসবাদ দিয়ে তারা বোঝান। তাতে আমাদেরও উপকার, তাদেরও উপকার, দেশেরও উপকার হবে। একইভাবে আমরা যখন তাদের দলের নীতিগুলির সমালোচনা করি, তখন সেগুলোকে গালাগাল বলে চোখ বুঁজে না থেকে আমাদের ভুল কোথায় তা তারা দেখিয়ে দিক। তাদের সম্বন্ধে আমরা কোনও কথা বলতে গেলে সেটাকে তারা গালাগাল ভাবে কেন? তাদের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্লোগানের ত্রুটির কথা বলা মানে কি তাদের গালাগাল দেওয়া? এতে গালাগালির কী হল? বিচার করবার মনটাকেই তারা মেরে দিতে চায় এইজন্যই যে, তারা বিপ্লবী রাজনীতির নামে একটা ধর্মের মতো অন্ধতা গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। এইসব বিষয় আমাদের দলের কর্মীরা ভাল করে তুলে ধরার চেষ্টা করুন। কারণ যুক্ত আন্দোলনের ক্ষেত্রে সি পি এম'ই সবচাইতে বেশি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। তার সাথে অবশ্যই একত্রে চলার মতো করে সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। আদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে যেমন কোনও আপস নয়, তেমনি মূল শত্রুর বিরুদ্ধে আবার তার সাথে একত্রে লড়তে হবে। লড়তে লড়তেও শত্রুতা নয়, সহানুভূতির মনোভাব থেকে তাদের ভুলভ্রান্তিগুলি ধরিয়ে দিতে হবে।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। আমাদের দলের বড় হওয়ার পদ্ধতির সাথে অন্যান্য দলের বড় হওয়ার পদ্ধতিগত পার্থক্য আছে। তারা সংগঠন বাড়াচ্ছে শাসক দলের সুবিধা নিয়ে। সব সংসদীয় দলই এটা করে। শাসন ক্ষমতায় থাকবার সুযোগ নিয়ে, তার সুবিধা নিয়ে তারা দলবল বাড়ায়। আমরা এভাবে ভাবি না। আমাদের বড় হবার নীতিটা আমরা অন্যভাবে ভাবছি। আমরাও বড় হতে চাই, বড় হচ্ছি, কিন্তু অন্য পদ্ধতিতে। শ্রমিক-চাষিদের কমিটিগুলো গঠন করে গণসংগ্রাম ও শ্রেণিসংগ্রামের পথে কর্মী তৈরি করতে এবং সাধারণ কর্মীদের মধ্য থেকে নেতৃত্ব তৈরি করতে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। গণসংগঠনগুলোর মধ্য থেকে, কৃষক-শ্রমিকদের মধ্য থেকে কর্মী তৈরি করে, আমরা নেতৃত্বে নিয়ে আসবার চেষ্টা করি। চেষ্টা করি যাতে চাষির ঘর থেকে,

শ্রমিকের ঘর থেকে কর্মী তৈরি করা যায়, নেতৃত্ব তৈরি করা যায়।

যুক্তফ্রন্টে আদর্শগত সংগ্রাম অপরিহার্য

ফলে যে কথাটা বলছিলাম, আমরা যুক্ত আন্দোলনের জন্য যুক্তফ্রন্ট গঠন করি। এটা আমরা সঙ্গত কারণেই করে থাকি। কিন্তু ঐক্যের স্বার্থে আমরা অন্যান্য পার্টির সাথে আদর্শগত সংগ্রামটা ছেড়ে দিতে পারি না, যার জন্য যুক্তফ্রন্টে আমাদের বিরুদ্ধে বারবার চাপ এসেছে। খাদ্য আন্দোলনের কথা আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। যখন আমরা ছোট ছিলাম, তখন থেকেই অবিভক্ত সি পি আই, আর এস পি এবং অন্যান্য দল আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করত এই বলে যে, তাদের সমালোচনা করলে আমরা যুক্তফ্রন্টে থাকতে পারব না। দু'বার আমাদের এই কথা বলে সরিয়ে দিতে চেয়েছে। অভিযোগ করেছে, অন্যান্য দলের সমালোচনা করলে তোমরা এই ফ্রন্টে থাকবে কেন? মানে হল, সমালোচনা করলে ফ্রন্টে থাকা যাবে না। ১৯৬৬ সালে আমার একটা বক্তৃতাকে কেন্দ্র করে এইভাবে তারা আমাদের আটকে দেবার চেষ্টা করেছে। প্রস্তাব পাশ করতে চেয়েছে, আচরণবিধি করে ব্যবস্থা নেবার চেষ্টা করেছে, ঐক্যের নামে সমালোচনা- আত্মসমালোচনা বন্ধ করতে চেয়েছে। আমরা তথ্য প্রমাণ দিয়ে তাদের মত খণ্ডন করে লিখেছি। ওদের মধ্যে একের অপরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব আছে বলে তারা আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি, নতুবা হয়তো আমাদের সরিয়েই দিত।

আমরা পরিষ্কার বলেছি, আদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে আপস করা যাবে না। সি পি এমের বক্তব্য, সি পি আইয়ের বক্তব্য, বাংলা কংগ্রেসের বক্তব্য ছিল, তাতে ঝগড়া হবে। আমরা একমত হইনি। অবশ্য পরে তারা মৌখিকভাবে হলেও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, আদর্শের কথা বাদ দিয়ে ঐক্যের কথা চলে না। এটা অনেকদিন ধরে লড়াই করে আমরা আদায় করেছি। ঐক্য করছি মানে আত্মসমর্পণ করছি না। আন্দোলনের স্বার্থেই অন্যদের তত্ত্ব, নীতি ও কর্মসূচির বিরুদ্ধে সমালোচনা করবার অধিকার আমাদের থাকবে। কারণ, তা না হলে মানুষ সচেতন হবে কী করে? ধরুন, যুক্তফ্রন্ট খাদ্যের উপরে বা শিক্ষার উপরে একটা নীতি ঠিক করতে চাইল। সেখানে কোন দল কি বলল, আমরা কি বলেছিলাম, অন্যান্য দল কি বলল, এইসব আলাপ-আলোচনা যদি মানুষ না জানে, তাহলে কোন দল সঠিক, তা মানুষ বিচার করবে কী করে? যুক্তফ্রন্টের বৈঠকে কোনও বিষয়ে অন্য একটি দলের মত গৃহীত হয়েছে, আমাদেরটা হয়নি। দেখা গেল, সেই মত গ্রহণ করার ফল খারাপ হল। কিন্তু জনসাধারণ

যদি না জানে যুক্তফ্রন্টের বৈঠকে কোন দল কি বলেছিল, তাহলে তো মনে করবে, আমরাও একই কথা বলেছি। আমরা যে সঠিক বক্তব্য নিয়ে সংগ্রাম করেও হেরে গিয়েছিলাম, বাকি দলগুলি সকলে মিলে যা গ্রহণ করেছে চেষ্টা করেও তা রুখতে পারিনি, এটা জনগণ জানবে কী করে? তাদের সিদ্ধান্ত রুখতে পারিনি আমাদের সংগঠনগত দুর্বলতার জন্য, রুখতে পারিনি নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই বলে। এটা জানলে তাহলেই তো জনতা বুঝতে পারবে যে, এই পার্টিটাকে শক্তিশালী করতে না পারলে অন্যদের ওপর নিয়ন্ত্রণকারী প্রভাব প্রয়োগ করতে পারা যাবে না। কোনও কর্মসূচি যখন সফল হয়, তখন তার গৌরব তারাই আত্মসাৎ করে। আর যখন ক্ষতি হয়, ভুল হয়, তখন বলে, এটা যৌথ সিদ্ধান্ত ছিল। অথচ আমরা যে সেদিন বিরোধিতা করে ভুল সিদ্ধান্তের বিরোধী ছিলাম, সেকথাটা জনতা জানতেও পারে না। তারাও ভাবে যে, ওই ভুলটা আমরাও করেছি, আমরাও দায়বদ্ধ ছিলাম। তাহলে জনতার সচেতনতাটা বিকাশলাভ করবে কী করে? আমরা জনগণকে সচেতন করব কী করে? তাই, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হিসাবে আমরা কোনও অবস্থাতেই আদর্শগত সংগ্রামের ব্যাপারে আপস করতে পারব না। ঐক্যটা কি নিছক ঐক্যেরই জন্য? এটা একটা পদ্ধতি, এটা সংগ্রামের একটা রূপ, যেটা ঐতিহাসিকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আমরা পছন্দ করি বা নাই করি, ইতিহাসের পদ্ধতি অনুসরণ করেই এর আবির্ভাব। এ হল সংগ্রামের একটা নির্দিষ্ট পরিস্থিতির রূপ বা প্রকাশ। ফলে যে ঐক্যের মধ্যে আমাদের দল এবং অন্যরা মিলে যাচ্ছে, তার চরিত্রটা কী, বুঝতে হবে। একদিকে সাধারণ ফ্রন্ট করে শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই, আর একদিকে নিজেদের মধ্যে পরস্পর আদর্শগত লড়াই — এ দুটোই একসঙ্গে চালাতে হবে। অন্যদের কিন্তু এতে বিরাট আপত্তি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে চলেছে। আমাদের একটা কথা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিককে আমরা বোঝাতে চেয়েছি, এখানে তাদেরকেও বোঝাতে চাইছি। সত্যিটা আমাদের বলতে হবে, আদর্শগত সত্যটা আমাদের বলতেই হবে। তাদের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং তাকে সমালোচনা করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। তাদের শ্রমনীতির দৃষ্টিভঙ্গি সুবিধাবাদী মনে হলে, মজুর আন্দোলনের ক্ষতি করবে মনে করলে, সমালোচনা আমাদের করতেই হবে এবং তা এক, দুই, তিন, চার করে আমরা দেখাব। আমরাই আবার সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে ফ্রন্টে তাদের পাশে থেকে প্রয়োজনে জান দেব। কিন্তু তারা যদি মনে করে যে, তাদের সঙ্গে ঐক্য করলে আমরা তাদের সমালোচনা করতে পারব না — তাহলে সেই ঐক্যে আমরা নেই। ওরা এসব বোঝে না। তারা ভাবে, ঐক্য যখন হয়েছে, তখন

সমালোচনা করলেই আমরা তাদের শত্রু হয়ে গেলাম।

তাদের ভাবখানা হল, তাদের সমালোচনা করলে হয় ফ্রন্টের বাইরে চলে যাও, নাহলে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ কর। আত্মসমর্পণ করলে, তার জন্য না হয় দুটো বেশি আসন আমাদের তারা দেবে। কিন্তু এস ইউ সি আই সে পথে যাবে না। এটা আর এস পি বা ওয়ার্কার্স পার্টির মতো দল নয় যে, পাঁচটা আসন পাওয়ার জন্য সাদা চেকে সই করে দেবে। না, এস ইউ সি আই তা দেবে না। সেইজন্য অনেকে বুঝতে পারে না যে, এত বড় একটা পার্টির বিরুদ্ধে না গিয়ে যুক্তফ্রন্টের আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক, বাংলা কংগ্রেস পর্যন্ত যেখানে সাদা চেকে সই করে দিয়েছে, আমাদের বিরোধিতাতে তারা কর্ণপাতও করেনি, বরং কমিটি করে জোড়াতালি দিয়ে চলার চেষ্টা করেছে — তখন এস ইউ সি আইকে সি পি এম টলাতে পারেনি কেন। এমন নয় যে, সি পি এম আমাদের টানতে চায় না। সি পি এমের ভাবখানা হল এইরকম যে, তাদের সঙ্গে গেলে, তারা যা বলবে তাই মানলে, তার জন্য দরকার হলে তারা সুরক্ষা দেবে। কে তাদের কাছ থেকে সুরক্ষা চেয়েছে? আমাদের সুরক্ষার কোনও প্রয়োজন নেই। আমরা কাউকে তেল দিতেও চাই না, কারোর কাছ থেকে সুরক্ষাও চাই না। আমাদের একমাত্র বক্তব্য হল, পরিষ্কার নীতি চাই।

একটা উদাহরণ দিয়ে বলি। যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে সি পি এম পুলিশ-প্রশাসন চালাবে আলাদা করেই, এতে দ্বিমত নেই। কিন্তু সি পি এমকে পুলিশ-প্রশাসনের লোকজনদের একথা বুঝিয়ে দিতে হবে যে, রাজনীতিতে সি পি এমকে এস ইউ সি আই যে সমালোচনা করে কোনো একটা কর্মসূচির জন্য হোক বা অন্য কোনও রাজনৈতিক কারণে হোক, তার জন্য সি পি এমকে তোয়াজ করে এস ইউ সি আইকে অবহেলা করা যায় না। বা এস ইউ সি আইয়ের দপ্তরে এস ইউ সি আইকে তোয়াজ করে সি পি এমকে অবহেলা করলে গোটা মন্ত্রীসভা এটাকে নিজেদের প্রতি অপমান বলে মনে করবে। কোনও মন্ত্রীর প্রতি কোনও অপমান, গোটা মন্ত্রীসভার প্রতি অপমান বলে বিবেচিত হবে। এই ধারণাটা তারা পুলিশের সামনে, প্রশাসনের সামনে আনবে। বলবে, আমাদের নিজেদের মধ্যে লড়ালড়ি আমরা করব। কিন্তু তার জন্য আমাদের পার্টিকে তোয়াজ করে তারা আর এক পার্টিকে অবহেলা করবে, এই আচরণ প্রতিফলিত হতে তারা দেবে না। পুলিশ-প্রশাসন সবার প্রতি সমান ব্যবহার করবে। কী করে এটা হবে? এটা হবে এবং এটা হতেই পারে। সাধারণভাবে প্রত্যেকের দপ্তর প্রত্যেকে চালাবে, কিন্তু এরকম কোনও অভিযোগ যদি কোনও অফিসারের বিরুদ্ধে থাকে যে, তিনি পক্ষপাতিত্বমূলক অবস্থান নিয়েছেন, তা যে কোনও

দপ্তরেই হোক, সেই মুহূর্তে সেটাকে ক্যাবিনেট স্তরে অনুসন্ধান করতে হবে। প্রমাণিত যা হবে তা প্রকাশ করা নাও হতে পারে, কিন্তু বৈষম্যমূলক আচরণ প্রমাণিত হলে সেই মন্ত্রককে সেই অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বাধ্য করতে হবে। কোনও মন্ত্রী বলতে পারবে না যে, এরকম হলে তার দপ্তরের অফিসারের বিষয়টি সে দেখবে, বা তার বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নেবে, সেটা সে ঠিক করবে। না, সেই অফিসারের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে, সেটাও মন্ত্রীসভা ঠিক করে দেবে। আর মন্ত্রীসভা যে শাস্তি সুপারিশ করবে, সেটা সেই মন্ত্রীকে পালন করতে হবে। একথা বলা চলবে না যে, ওই অফিসারের সঙ্গে তার যেমন দহরম-মহরম, তাতে তাকে শাস্তি দিলে সে প্রশাসন চালাতে পারবে না, এরকম হলে তার উপর সেই অফিসার বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে। সেই মন্ত্রী দলের নেতা হলেও তার পার্টি তাকে ছাঁটাই করবে। মনে রাখতে হবে, বিভিন্ন দলের যারা মন্ত্রীসভাতে আছে তাদের দ্বিগুণ দায়িত্ব রয়েছে — নিজের পার্টির প্রতি দায়িত্ব, যুক্তফ্রন্ট গঠন করেছে যে সাধারণ মানুষ তাদের প্রতি দায়িত্ব। ফলে অফিসারকে সন্তুষ্ট করে সে দলকে সন্তুষ্ট করবে, নাকি যুক্তফ্রন্টকে সন্তুষ্ট করবে? হয় এটা, না হয় ওটা, এমনভাবে অতি সরলীকৃত পথে ভাবে আহাম্মকরাই। এটা একটি জটিল পদ্ধতি, এটা গুরুদায়িত্ব বহন করার জায়গা। এখানে রাগ করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ত্যাগ করা যায় না, অথচ ত্যাগ না করলে নানা ঝঞ্ঝাট পোহাতে হবে। এখানে দুর্নীতি আছে, চারদিক থেকে একসঙ্গে তা ছেঁকে ধরছে, তার হাত থেকেও নিজেকে রক্ষা করতে হবে। কাজেই বিপদ আছে, আর বিপদ এড়িয়ে জান বাঁচিয়ে চলা যাবে না।

সমালোচনা মানেই শত্রুতা নয়

এই যে প্রক্রিয়া, এই প্রক্রিয়ার মধ্যে ওদের একটা কথা আমরা কিছুতেই বোঝাতে পারছি না যে, হয় গলাগলি, না হয় গালাগালি — এটা মার্কসবাদ নয়। আগের দিনের মানবতাবাদীদের একটা নীতি ছিল যে, মোসাহেবদের বড় মানুষরা পছন্দ করত না। কিন্তু এরা এমন কমিউনিস্ট নৈতিকতার অধিকারী যে, তাদের যত বেশি তেল যারা দেয়, এরা তাদের তত বেশি পছন্দ করে, অন্যদিকে সমালোচনা করলেই শত্রু মনে করে। অথচ মার্কসবাদের একটা বড় শিক্ষা যে, সৎ মানুষরাও সমালোচনা করে। সমালোচনা যে করে, সেই লোকটা সবসময় খারাপ লোক হয় না। কেউ সমালোচনা করল বলেই কি সে তার শত্রুতা করবে? যাদের ধারণাটা এতটাই অস্বচ্ছ, তাদের বিপদে সবাই তাদের ছেড়ে পালিয়ে যায়। ১৯৬২ সালের কথা ভেবে দেখুন। যখন চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ হল,

তখন সকল পার্টিই সি পি আইকে ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে কত বক্তৃতাই না করল। আমরা এত বড় সমালোচক হলেও সেদিন তাদের ছেড়ে যাইনি। তারা তো সেদিন বিপদেই ছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্কটে এস ইউ সি আই ছাড়া একে একে অন্য সবাই তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল। অথচ এই এস ইউ সি আইকে তারা শত্রুর মতো দেখে। কিন্তু আমাদের কোনও শত্রুতার মনোভাব নেই। আমরা সমালোচনা করি আদর্শের কারণে, জনগণের সামনে সঠিক রাজনীতিটা স্বচ্ছ করে রাখবার জন্য, আনবার জন্য। আমরা জেনে বুঝেই ঐক্য করেছি, আমরা সি পি এম, সি পি আই কী তা জানি, আর এস পির বিপ্লব কী তাও জানি, ওয়ার্কার্স পার্টির কদর কী তাও জানি, বাংলা কংগ্রেস কী জাতের পার্টি, তাও জানি। এই বাংলা কংগ্রেসকে ফ্রন্টে এনেছে সি পি আই, সি পি এম। ওরা ডেকে আনল। প্রথম যখন কংগ্রেস ছেড়ে বাংলা কংগ্রেস বেরিয়ে এল, তখন তারা যুক্তফ্রন্টে ছিল না। বাংলার মানুষ তাদের প্রগতিশীল বামপন্থী শক্তি হিসাবে গ্রহণ করেনি, কংগ্রেসের বিচ্ছিন্ন অংশ হিসাবেই মনে করেছিল। পশ্চিম বাংলায় তাকে বামপন্থী সাজিয়ে দিয়েছে সি পি আই, সি পি এম। আজকে তারা বড় বড় কথা বলছে। আজ যুক্তফ্রন্টের বাকি দলগুলির মধ্যে লড়াই হচ্ছে তুচ্ছ পার্টি স্বার্থে, তাদের মধ্যে কে কতখানি ভাগ পাবে তার লড়াই। এ লড়াই কালই মিটে যেতে পারে। আবার ফ্রন্টের মধ্যেই এস ইউ সি আইকে ঠেকাতে সি পি আই, সি পি এম, আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক, বাংলা কংগ্রেস এই পাঁচ পার্টি মিলে আরেকটা ছোট ফ্রন্ট করে ফেলতে পারে। বাস্তবে সেটা ছিল ফ্রন্টের ভিতরে আরেকটা ফ্রন্ট, এস ইউ সি আইয়ের বিরুদ্ধতা করতে সেটা গড়ে উঠেছিল। আদর্শগতভাবে এস ইউ সি আই-এর প্রভাব, তার প্রোগ্রাম, তার সমালোচনাগুলোকে এড়িয়ে চলা যখন যাচ্ছে না, তখন এইরকম একটা কৌশল করে এস ইউ সি আইকে সি পি এম কোণঠাসা করার চেষ্টা করেছে এবং সেখানে বাংলা কংগ্রেস হল তার অংশীদার। ওরা যেমন গায়ের জোরে দল বৃদ্ধির চেষ্টা করেছে, আবার এভাবেও এস ইউ সি আইয়ের প্রভাব খর্ব করতে চেষ্টা করেছে। এখন ভয় পাওয়ার যারা তারা পাক, আমাদের দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই, ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। কারণ এভাবে একটা শক্তিকে রোখা যায় না। বরং আমরা মনে করি, এটা ভালই হয়েছে, ওরা নিজেরা নিজেদের স্বরূপ প্রকাশ করছে।

তাই আগেও বহু মিটিং-এ আমি আপনাদের সামনে ব্যাখ্যা করেছি, সি পি এমের কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন. সাধারণ কর্মী-সমর্থকদের প্রতি আমাদের কী মনোভাব হবে। আমরা আমাদের আদর্শগত সংগ্রামের প্রশ্নে এক ইঞ্চিও জমি

ছাড়ব না, আবার তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে চলতে হবে। এ অত্যন্ত কঠিন কাজ। একই সাথে আত্মরক্ষার প্রস্তুতিও আমাদের নিতে হবে, অর্থাৎ, ওরা যখন আক্রমণ করবে, তর্কবিতর্ক না করে যখন শারীরিকভাবে আক্রমণ করে আমাদের স্তব্ধ করতে চাইবে, তার বিরুদ্ধে আমাদের আত্মরক্ষাও করতে হবে। এই দুটো জিনিসকে যদি আমরা একত্রে মিলিয়ে নিয়ে চলতে পারি, অর্থাৎ, রাজনৈতিক প্রচার এবং মানুষকে সপক্ষে নিয়ে আসার কঠিন কাজ ও তীব্র মতাদর্শগত সমালোচনার সঙ্গে একই সাথে আত্মরক্ষার কাজ যদি আমরা করতে পারি, তাহলে ভবিষ্যতে আমরা জয়ী হব। ইতিমধ্যেই বাংলা কংগ্রেস, সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। কারণ নিজস্ব সাংগঠনিক শক্ত ভিত্তি এদের নেই। তারা সংসদীয় রাজনীতিতে ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে, এই ভয়ে সি পি এমকে খুব ভয় পাচ্ছে। আর অন্যেরা এত কথা ভাবেই না। তারা বরঞ্চ ভাবে, সি পি এমের সঙ্গে থাকলে সামনের বার হয়তো আরও দু' চারটে আসন তারা বেশি পাবে। পাবে কি না সেটা পরের কথা, কিন্তু তারা এখন এভাবেই ভাবছে। কিন্তু আমরা বিন্দুমাত্র ভীত নই। আমরা বরঞ্চ একটি বিষয় লক্ষ করছি, যেসব মানুষ এইসব রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে যুক্ত, আর যারা একদম প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেস শিবিরের লোক — প্রগতির ধারণায় যারা চলে না, খোলাখুলি যারা ঘোষণা করে যে, তারা সংকীর্ণতা-অন্ধতার পক্ষে — এই দুই শক্তির মাঝখানে পশ্চিম বাংলায় যে বিরাট জনসাধারণ রয়েছে সেটাই বড় অংশ এবং জনসাধারণের সেই অংশ যুক্তফ্রন্টের উপর ক্ষুব্ধ হচ্ছে এবং সি পি এমের উপর ত্যক্ত-বিরক্ত হচ্ছে। কাজেই যুক্তফ্রন্টের সমর্থক এই ক্ষুব্ধ মানুষজন এবং তার দলবলের সংখ্যাটা ক্রমশ বাড়ছে। সেটা দেখে মাথা খারাপ করার কিছু নেই, এদের কীভাবে আবেদন করতে হবে, সে কথাটাই আমি বললাম।

তাহলে এই যে জটিলতা, এত জটিলতার মধ্যেও আমাদের তরফে মানসিকতাটা হবে, শত্রুতার মনোভাব নয়, কিন্তু মতাদর্শগত সংগ্রামে কোনও আপস নয়। দেখুন কীভাবে আমরা ঐক্য রক্ষা করেছি। ওরা আমাদের খাদ্য আন্দোলনে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, বেরিয়ে আসতে বাধ্য করেছিল, কিন্তু তবু আমরা ঐক্য রক্ষা করেছি। আমরা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে থেকেছি। কারণ আমরা জানি, কীভাবে ঐক্য রক্ষা করতে হয়। সাময়িকভাবে গায়ের জোরে তারা ঐক্য ভাঙতে চাইলেও বারবার সেই ঐক্যের মধ্যে থাকা আমাদের প্রয়োজন। কিন্তু আদর্শগত সংগ্রামে আমরা আপস করি না। যখন ঐক্য তখন কোনও সংগ্রাম নয়, আবার যখন সংগ্রাম তখন কোনও ঐক্য নয়— এ জিনিস নয়। হয় গলাগলি না হয় গালাগালি, এই ধারণা ছাড়তে হবে।

বিপ্লবের জন্য শক্তি চাই

নভেম্বর বিপ্লবের আর একটা মূল্যবান শিক্ষা এই প্রসঙ্গে বলে যেতে চাই। শিক্ষিত মহল থেকে একটা কথা প্রায়শই বলা হয়ে থাকে যে, দক্ষ লোক ছাড়া রাষ্ট্রক্ষমতা চালানো যায় না, তা সেই রাষ্ট্রক্ষমতা শ্রমিক-মজুররা চালাবে কী করে? লেনিন এর একটা উত্তর দিয়ে বলেছেন, হ্যাঁ নিশ্চয়ই দক্ষ প্রশাসক (কলাকুশলী) দরকার, কিন্তু এটাই সবচাইতে প্রধান কথা নয়। প্রধান কথা হল, শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গি, আদর্শ। প্রশাসকদের নিজস্ব কোনও আদর্শ থাকে না। প্রশাসকদের যদি কোনও আদর্শ থাকে, তবে তা হয় এই শ্রেণির আদর্শ, অথবা অন্য শ্রেণির আদর্শ। প্রশাসকরা সে সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে পারেন এই মাত্র। তাই কেউ যদি বলে যে, অশিক্ষিত শ্রমিকদের দিয়ে প্রশাসন চলবে কী করে, তাহলে এই মৌলিক প্রশ্নটা বাদ দেওয়া চলে না। তারা আজ প্রশাসনের লোকজন যেভাবে বুর্জোয়া প্রভুদের সেবা করছে, বিপ্লবের পর শ্রমিকরা যদি ক্ষমতা দখল করতে পারে, একই ভাবে তারা তখন সর্বহারা প্রভুকে সেবা করবে। এদের বিষয়ে দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই, পয়সা দিলেই প্রশাসকরা যারা ক্ষমতায় তাদের সেবা করবে। আবার আরও একটা কথাও ঠিক যে, যেহেতু বুদ্ধিজীবীরা, প্রশাসকরাও মানুষ, সেহেতু তাদের মধ্যে মানবিক আবেদন আছে বলে, এই বিপ্লবের প্রক্রিয়ার মধ্যেই আমরা বহু প্রশাসকের মন জয় করে বিপ্লবের পক্ষে নিয়ে আসতে পারব। যাদের পারব না, তাদের নিয়েও চিন্তার কারণ নেই। তারা করে খাবার জন্যই যেভাবে বুর্জোয়া প্রভুদের সেবা করেছে, তেমনি শ্রমিকদেরও সেবা করবে। শ্রমিকদের ফেলে দেবার ক্ষমতা তাদের নেই, কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রশাসকদের হাতে থাকে না। যারা রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে, শক্তি তাদের হাতেই থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদন ও বণ্টনকে কেন্দ্র করে সামাজিক অন্যায়, অসাম্য এবং বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব সমাজে থাকবে, সামাজিক চেতনার সঙ্গে ব্যক্তিস্বার্থের দ্বন্দ্বটা বিরোধাত্মক প্রকৃতির থাকবে, মিলনাত্মক হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজের সামগ্রিক ঐক্যকে রক্ষা করবে, আইনকে রক্ষা করবে, অন্যায়কে ঠেকাবে, ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করবে শক্তি এবং ততক্ষণ শক্তি প্রয়োগ করতেই হবে। তাই প্রতিবিপ্লবের জন্য যেমন, তেমনই বিপ্লবের জন্যও শক্তি প্রয়োজন। এটা নভেম্বর বিপ্লবের আরেকটি শিক্ষা। যাঁরা বলেন, শক্তি ছাড়া বিপ্লব হবে, তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। তাঁরা যদি সৎ হন, তাহলে বলতে হয়, তাঁরা না জেনে স্রেফ পুঁজিপতিশ্রেণির হাতের পুতুল হিসাবে কাজ করছেন। শক্তি ছাড়া বিপ্লব করাও যাবে না, রক্ষা করাও যাবে না। কোনও

প্রতিক্রিয়াবাদীরাও যদি প্রতিক্রিয়ার শাসন চালু রাখতে চায়, শক্তি ছাড়া তারা তা পারে না। এই শক্তির দুটো দিক আছে। একটা হল, জনসমর্থনের দিক, অর্থাৎ জনতাকে কতটা আদর্শগতভাবে জয় করে নেওয়া যায়, আরেকটা হচ্ছে তার সশস্ত্র বাহিনীর দিক। কিন্তু জনতার সংঘশক্তিই আসল, এটা অর্জন করতে পারলে তবেই সশস্ত্র বাহিনীর শক্তি মহীয়ান হয়ে উঠবে। তাই জনতা যতক্ষণ অসংগঠিত, বিচ্ছিন্ন, বিভ্রান্ত, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অধীনে রয়েছে, ততক্ষণ মিলিটারি হল নির্ধারক শক্তি । অর্থাৎ, সামরিক শক্তির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত বুর্জোয়া রাষ্ট্রশক্তি। এটাই নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা।

শ্রমিক শ্রেণির সঠিক বিপ্লবী দল চাই

নভেম্বর বিপ্লব আরেকটি শিক্ষাও দিয়েছে, তা হচ্ছে, বিপ্লবকে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে, চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে নিয়ে যেতে হলে, শ্রমিকশ্রেণির একটি সঠিক বিপ্লবী দল অবশ্য প্রয়োজন। ব্যক্তিগতভাবে একজন শ্রমিক কতটা বিপ্লব বোঝে তা নয়, তার মানটা কী, তাও নয়। মূল কথা হচ্ছে, শ্রমিকশ্রেণি শ্রেণিগত ভাবে বিপ্লবের জন্য কতটা তৈরি। দলের শ্রমিকরা বিপ্লব বোঝে না, তাহলে আবার শ্রমিকশ্রেণির পার্টি কী — এইরকম ফাঁকির কথা নয়। লেনিন বিষয়টা নিয়ে বলেছেন, পিছিয়ে-পড়া দেশে এটা যতটা সমস্যা, অগ্রসর দেশগুলিতে ততটা নয়। অগ্রসর দেশগুলিতে শ্রমিকের ছেলেদেরও বৌদ্ধিক ও বৈজ্ঞানিক চর্চার সুযোগ আছে, যেটা পিছিয়ে-পড়া দেশে নেই। পিছিয়ে-পড়া দেশের শ্রমিকদের এই সমস্যাটার জন্য লেনিনও বলেছেন, পিছিয়ে-পড়া দেশগুলিতে শ্রেণিচ্যুত (ডিক্লাস্‌ড) মধ্যবিত্তশ্রেণি থেকে বেশি কর্মী আসবে। কিন্তু এখানে আরও একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, মার্কসবাদের দুটো দিক আছে। একটা হল, শোষণ-আক্রমণের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামের দিক —. সাধারণ মানুষের এর প্রতি আকর্ষণ। কিন্তু এটাই তার মূল আকর্ষণের দিক নয়। তাই যদি হত, তাহলে আমেরিকা দেশে দেশে যে হাওয়াটা তুলছে, তাতে কাজ হত। আমেরিকা বলছে, পিছিয়ে-পড়া দেশগুলোকে শিল্পোন্নত করলে, জীবনযাত্রার মান বাড়াতে পারলে, অর্থাৎ, ঋণ হিসাবেও যদি টাকা গুঁজে দেওয়া যায়, তাহলে মানুষ বিপ্লবের পথ ছাড়বে। না, তা তারা ছাড়বে না, কারণ বিপ্লবের আরেকটা দিক আছে, যেটাকে তারা উপেক্ষা করছে, সেটা হচ্ছে, মানবিক আবেদনের দিক, মনের দিক।

মানুষের মনেরও একটা দিক আছে। যেমন, মানুষ যৌনতা চায়, কিন্তু তাই বলে কি পশুর মত তা আকছার চায়? মানুষের যৌন আকাঙ্ক্ষাটা কি রুচি-

সংস্কৃতি থেকে আলাদা করা যায়? না, আলাদা করা যায় না। তার যৌন আবেদনটাও রুচির সঙ্গে, সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে আছে। তাই একটা মানুষ — তাকে যৌনতা দিলাম, তাকে বিলাসী জীবনযাপন করতে দিলাম, তাকে মদের বোতল দিলাম — তা সত্ত্বেও সে দু'দিনেই অস্থির হয়ে উঠবে। কারণ, তার একটি মন আছে, যেটাকে আপনি সাহায্য করতে পারছেন না। সেই মনটি কিছুতেই এতে সন্তুষ্ট থাকতে পারবে না। তার মনেরও খাদ্য চাই, সে আরও অনেক কিছু চাইবে। তাই তো তার ব্যক্তিত্ব, তার সম্ভ্রমবোধ বাদ দিয়ে শুধু নারী-মদ-মাংস-জামা- কাপড়-টেরিলিন দিলেই সে সন্তুষ্ট থাকে না। সে পাঁচদিন ঝিমিয়ে থাকতে পারে, যেমন আফিম খেয়ে মানুষ ঝিমিয়ে থাকে। কিন্তু ছ' দিনের দিন সে মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠতে চায়, যা এই আমেরিকার ক্ষেত্রে হচ্ছে। এত বছর ধরে আমেরিকান যুবকদের রাজনীতি বিমুখ করে রাখা হয়েছিল, কিন্তু আজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যুব সম্প্রদায় মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, তারা মার্কিন মিলিটারি শাসনের বিরুদ্ধে মাথা তুলছে। সেখানে গণতন্ত্রের মুখোশ খুলে পড়ছে। সেখানে স্লোগান উঠছে, ভিয়েতনাম থেকে হাত গোটাও। আমেরিকার ভেতরেই প্রচণ্ড বিক্ষোভ। চিরকাল কি মানুষকে ভুলিয়ে রাখা যায়? তাই এই দিকটাকেও দেখতে হবে। শাসকরা এটা দেখতে পায় না। তাই নভেম্বর বিপ্লব শক্তির এই দিকটা নির্দেশ করছে। বলছে, জীবন বিকাশের পথ মুক্ত করে দাও, তাহলেই দেখতে পাবে, বিপ্লব অনিবার্য। বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী, বিপ্লব হবেই। কবে হবে, কত তারিখে হবে, সেটা আলাদা প্রশ্ন। আবার হবে মানে কি নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকলেও হবে? না, তা নয়। যে মানুষগুলো বিপ্লব করতে চায়, বিপ্লব না হলে যাদের মুক্তি হবে না, তারা যত তাড়াতাড়ি বিপ্লব সংগঠনের দায়িত্ব নেবে, এগিয়ে আসবে ত্যাগ করবার জন্য, দায়িত্ব নেওয়ার জন্য তৈরি হবে — তত তাড়াতাড়ি দেশে বিপ্লব হবে, না হলে বিপ্লব অপেক্ষা করবে। এযুগে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হোক, বা স্বাধীনতার সংগ্রাম হোক, বা সরাসরি পুঁজিবাদ উচ্ছেদের বিপ্লব হোক, বিপ্লবটি যদি শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে না হয়, তাহলে সে বিপ্লব সঠিক পরিণতিতে পৌঁছাবে না।

শুধু কোটেশন আউড়ে বিপ্লব হবে না

নভেম্বর বিপ্লব অপর একটি শিক্ষাও দিচ্ছে, তা হচ্ছে, শুধু মার্কস, এঙ্গেলস লেনিন, স্ট্যালিন, মাও-এর কোটেশন আউড়ে কোনও দেশে বিপ্লব হবে না। মার্কসবাদের যে সাধারণ শিক্ষা, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ এবং আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে যে শিক্ষা, সেই শিক্ষাগুলোকে নিয়ে

নিজের দেশের জনসাধারণকে সংগঠিত করে যে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, সেটা করতে গিয়ে সেই দেশের পার্টি সেই শিক্ষাগুলোকে যদি সেই দেশের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে না পারে — সঠিকভাবে করতে গেলেই তাকে খানিকটা উন্নত করতে হবে এবং সেই অর্থে তারা যদি উন্নত করতে না পারে, বিশেষীকৃত করতে না পারে, বিকশিত করতে না পারে — তাহলে নকল করে কোনও দেশে বিপ্লব হবে না। ঐতিহাসিক ঘটনার উদাহরণ দেখিয়ে বা উপমা দিয়ে, অর্থাৎ, অমুক দেশে এভাবে হয়েছে, সুতরাং আমাদের দেশেও এভাবে করতে হবে — এভাবে কোনও দেশে বিপ্লব করা যাবে না। এক ধরনের বিপ্লবী আছে, যারা পুঁথি পড়ে পড়ে বিপ্লবের বুদ্ধিজীবী সেজে, নেতা সেজে বিপ্লবের কোমর ভেঙে দিচ্ছে। তাই লেনিনের একটি বিখ্যাত কথা আছে, তা হচ্ছে, মার্কস-এঙ্গেলস ও অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতাদের অভিজ্ঞতা আমাদের সামনে সাধারণ শিক্ষা হিসাবে আছে, মার্কসবাদের সাধারণ শিক্ষাকে তাঁরা তুলে ধরেছেন, আমরা তার দ্বারা মার্কসবাদে উদ্বুদ্ধ। কিন্তু দেশে দেশে বিপ্লবের ক্ষেত্রে এই মার্কসবাদের সাধারণ শিক্ষার প্রয়োগ ভিন্ন ভিন্ন হবে। ফ্রান্সে যেভাবে প্রয়োগ হবে, জার্মানিতে সেভাবে নয়, জার্মানিতে যেভাবে হবে, বার্মায় সেভাবে নয় — ইত্যাদি ইত্যাদি। এর কারণ হল এই যে, বাস্তব ক্ষেত্রে মার্কসবাদের সাধারণ শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করে, বিশেষীকৃত করে, বিকশিত করে বিষয়টাকে দাঁড় করানোর মানেই হল, যদি মূল মূল সিদ্ধান্ত ও মূল মূল নীতির ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন সূচিত নাও হয়, তবু মার্কসবাদের বহু উন্নতি ঘটাতে হবে। ফলে মার্কসবাদী বিজ্ঞানকে অন্তত প্রয়োগ পদ্ধতিতে উন্নত না করে, কোনও দেশে বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়া যায় না। তাই শুধু কোটেশন আউড়ে, সাদৃশ্য দেখিয়ে, তুলনা দিয়ে যারা বিপ্লব করতে চায়, তারা বিপ্লবের মেকি নেতা। বিপ্লবের সঠিক নেতৃত্ব গড়ে তোলার পথ হল, এমনভাবে মার্কসবাদের সাধারণ শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতাগুলোকে আয়ত্ত করতে হবে, যাতে যারা বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে, তারা তাদের নিজের দেশের পরিস্থিতিতে তাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রয়োগ করার মধ্য দিয়ে মার্কসবাদের তত্ত্ব এবং প্রয়োগ কৌশল পদ্ধতিতে তাদেরও কিছু অবদান রাখবে, তারাও কিছু উন্নতি করবে, তবেই বিপ্লব ঘটবে।

১৩ নভেম্বর, ১৯৬৯ প্রদত্ত ভাষণ।
২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে
পুস্তিকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়।